ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ■ মাঘ- ফাল্গুন ১৪২৯

# নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

## ভাষা আন্দোলন নেপথ্যে বঙ্গবন্ধু

**লুতফি ইসলাম (নিশাত)**, ষষ্ঠ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা

**আফিফা মাইমুনা লাবিবা**, দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

# সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি। বন্ধুরা, ফেব্রুয়ারি মাসের এই দিনটিতে কি ঘটেছিল, তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। তাই তো ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমরা গেয়ে উঠি এই গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি।' ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলন শুরু। 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'– পাকিস্তান সরকারের এমন ঘোষণায় পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ অন্যায় এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এই দিন পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে রাজপথে প্রাণ দেয় সালাম-শফিক-রফিক-জব্বার-শফিউরসহ আরো অনেক নাম না জানা ভাষা শহিদ। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যাদের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। এই ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ নামের একটি সবুজ-সুন্দর-স্বপ্নময় দেশ।

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ আমাদের ভাষা শহিদ দিবস। ভাষার জন্য বাংলার সন্তানদের এই বিরল আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর। এদিন ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। এদিন আমরাও শহিদমিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই ভাষা শহিদদের। এই মাসটিকে ঘিরে থাকে নানা আয়োজন। অমর একুশের বইমেলা এই আয়োজনে নিয়ে আসে এক ভিন্ন মাত্রা।

বন্ধুরা, ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– স্মার্ট গ্রন্থাগার, স্মার্ট বাংলাদেশ। আমরা চাই প্রত্যেক ঘরে-স্কুলে-পাড়া-মহল্লায় বেশি বেশি গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক। সবার মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ।

ছোট্ট সোনামনিরা, 'পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার শুরু হয়েছে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের আয়োজন অমর একুশে বইমেলা। বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা, সবার মেলা। মেলা থেকে নতুন নতুন বই কিনব, অন্যকে উপহার দিবো, আর পড়ার আনন্দে মেতে উঠব।

ভালো থেকো ছোট্ট বন্ধুরা। সবার জন্য শুভকামনা।


**প্রধান সম্পাদক**
মোহাম্মদ আলী সরকার

**সিনিয়র সম্পাদক**
ডালিয়া ইয়াসমিন

**সম্পাদক**
নুসরাত জাহান

**সিনিয়র সহ-সম্পাদক**
শাহানা আফরোজ

**সহ-সম্পাদক**
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

**সহযোগী শিল্পনির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ**
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

**মূল্য : ২০.০০ টাকা**

**মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

# সূচিপত্র

## নিবন্ধ


ভাষা আন্দোলন: নেপথ্যে বঙ্গবন্ধু/সাইদ হাসান দারা ০৪
বইমেলার ইতিকথা/ড. আবদুল আলীম তালুকদার ১২
যার হাত ধরে বইমেলা/মো. মনজুর হোসেন পাটোয়ারী ১৫
বঙ্গবন্ধু ও বুলেটবিদ্ধ বই/শামীম আজাদ ২৪
আমাদের ভাষা সৈনিক/কামাল হোসাইন ২৬
বাংলা ভাষার কদর/মো. জামাল উদ্দিন ৪৫
বাংলাদেশের ৪১টি ভাষা/শাহানা আফরোজ ৪৭
ভাষার গবেষণা/শরিফ উদ্দিন ৪৯
ভাষার চিত্র-বিচিত্র/সাজিদ হোসেন ৫১


## গল্প


অগ্নি মিছিল/মমতাজ আহাম্মদ ১৮
একুশ, মাতৃভাষা ও মায়ের গল্প/বশিরুজ্জামান বশির ২১
বর্ণবাড়িতে আদনান/মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী ৩০
এক যে ছিল কোকিলরাজ্য/এস আই সানী ৩৩
দেওয়াল বিজ্ঞাপন/আশরাফ আলী চারু ৩৯
একুশের দিনে/মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন ৪১
রানুর খালি হাত/সারমিন ইসলাম রত্না ৪৪
বাংলা নাম ইংরেজিতে লেখা/তারিক মনজুর ৫৩


## কবিতা ও ছড়া


১৪ রোমানুর রহমান
১৬ আব্দুস সালাম
১৭ আবু নাসের সিদ্দিক তুহিন
শাহরিয়ার শাহাদাত/আ. শ. ম. বাবর আলী
২৩ মো. জাহাঙ্গীর আলম
২৯ কাব্য কবির/সোহরাব পাশা/মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ
৪৩ শহীদুল্লাহ শোভন
৫৭ আলমগীর কবির


## ছোটোদের ছড়া/লেখা


৪৩ মো. মিহির হোসেন
৫৭ জাওয়াদ আহমেদ


## ছোটোদের আঁকা


দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: লুতফি ইসলাম (নিশাত)/আফিফা মাইমুনা লাবিবা
৩২ পড়শী চক্রবর্ত্তী/রুসাব
৫২ জুলকার নাইন প্রাচুর্য
৫৭ শারিকা তাসনিম নিধি
৬৩ শান্ত/জায়েদ হক
৬৪ আব্দুল কাদের জিলানী/হিল্লোল রায়


## সাফল্য প্রতিবেদন


তিন কিশোরীর স্বর্ণপদক অর্জন/জান্নাতে রোজী ৫৮
সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ/মেজবাউল হক ৫৯
স্বর্ণজয়ী অ্যাথলেট/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৬০
শুদ্ধ করে শিখি ৫৬
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৬১


নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি।
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো। একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

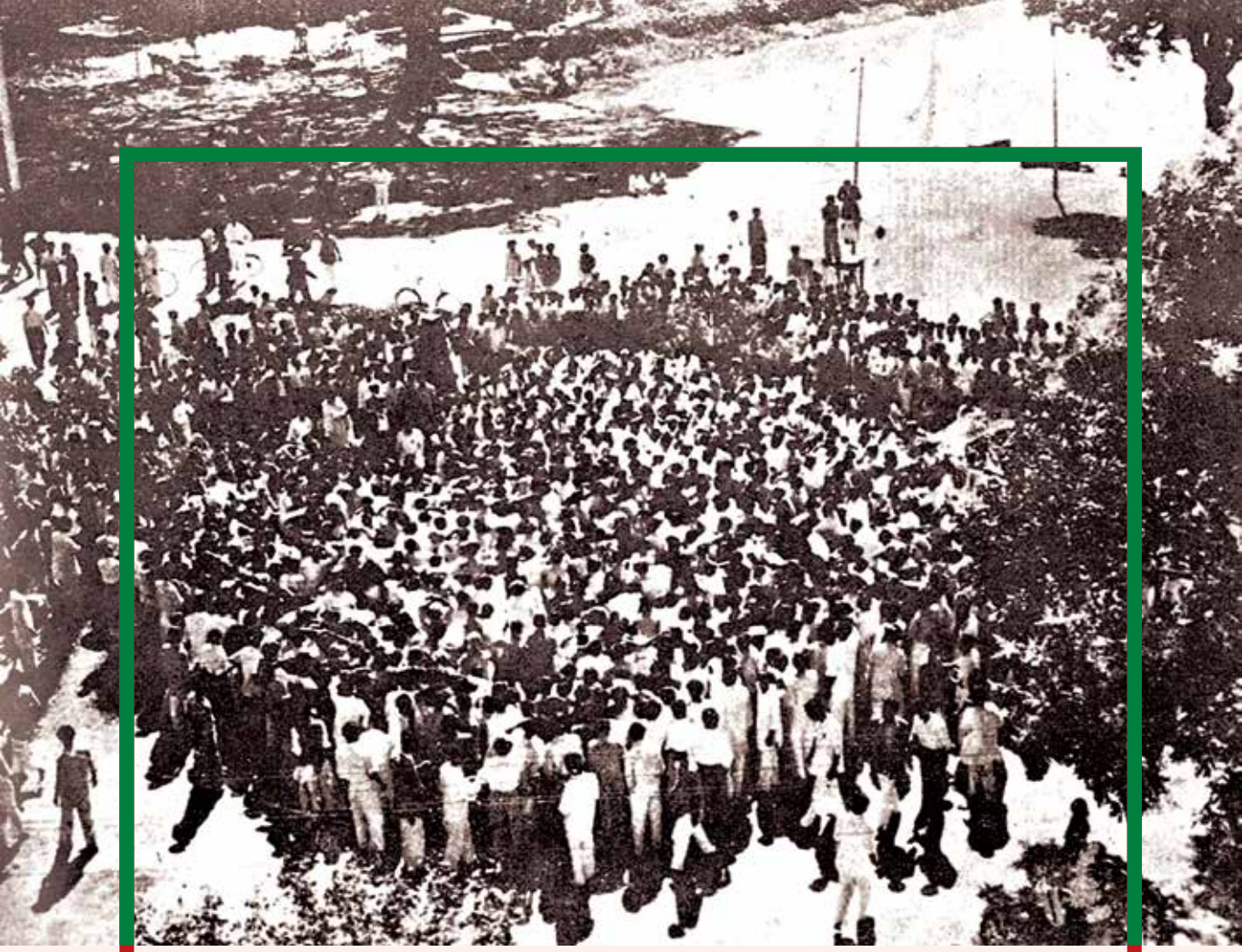

# ভাষা আন্দোলন নেপথ্যে বঙ্গবন্ধু

সাইদ হাসান দারা

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হবার পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ গঠনের মাধ্যমে তাঁর সুদূরপ্রসারী স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেন এবং সেই দুর্গম পথ পরিক্রমার যাবতীয় প্রস্তুতি-প্রেরণ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। কেননা পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যে, অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আশা করেছিলেন সেটা দেশভাগের পরবর্তী মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। এর ফলে মুসলিম লীগের রাজনীতির ধারাটি দুটি আলাদা আলাদা ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দিন তখন স্পষ্টতই করাচি মুসলীম লীগ সরকারের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বাঙালির স্বার্থ-বিরোধী নেতায় পরিণত হন। তাঁর উপ-দলটি (করাচিস্থ মুসলিম লীগ) পবিত্র ইসলাম ধর্মের মোড়কে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অধিষ্ঠিত হতে

থাকে। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী তথা : ছাত্র, যুবক এবং অন্যান্য রাজনীতিক কর্মীরা ছিলেন মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক।

এই অবস্থায় স্বাধীন পাকিস্তান সরকারের বাঙালি বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে শেখ মুজিব ভেতরে ভেতরে খুবই ক্ষুব্ধ হন। কারণ তিনি পরিষ্কার করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সাম্প্রদায়িকমুখী এবং বৈষম্যসৃষ্টিকারী সরকার ব্যবস্থাপনায় আর যাই হোক বাঙালিদের কোনো কল্যাণে আসবে না। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য বাঙালির যে অবদান সেটাকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। তাদের সেই বিষয়টা এমন হয়েছে যে, তারা দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কোনো অবস্থায় নেই এই নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায়।

তারা কেবলমাত্র এক ঔপনিবেশকের বদলে অন্য আরেক ঔপনিবেশকের হাতে ধৃত হয়েছে। আর এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বাধীনতা। কাজেই তিনি ভেতরে ভেতরে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে কাজ শুরু করে দেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভেতরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে জাগিয়ে তোলা, ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারিতে আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন। এরপর সংগত কারণেই তিনি মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে এই সংগঠনের নতুন নামকরণ করেন ছাত্রলীগ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে পুরোপুরিভাবে তাদের কলোনিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়, এটা তাদের প্রথম কার্যক্রম থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কারণ শুরুতেই নতুন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে যেমনভাবে অর্থনৈতিক শোষণের জাল বিস্তার করে বসে; তেমনিভাবে বাঙালির অস্তিত্ব বিলীন করতে তার ভাষা এবং এই জাতির ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি সমূলে উপড়ে ফেলার কাজে নামে। কারণ তারা ভালোভাবেই জানত, যদি পৃথিবী থেকে কোনো জাতিসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তীকরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের প্রতি নির্মম বৈরি আচরণ, কঠোর দমননীতি, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি সেই জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কাজেই তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর চরমভাবে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল প্রকার বৈষম্য চালাবার পাশাপাশি সংস্কৃতির উপর চরম আগ্রাসন চালাতে বদ্ধপরিকর হয়।

এ-লক্ষ্যেই তারা ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের বয়স যখন মাত্র ১৯৪ দিন; সেদিন করাচিতে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষে দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়- **এক.** বছরে অন্তত একবারের জন্য হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব। **দুই.** দ্বিতীয় সংশোধনীর খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ২৯ নম্বর ধারা সম্পর্কে (এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল, গণপরিষদের প্রত্যেক সদস্যদেরকে উর্দু অথবা ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতে হবে)।

এজন্য বিরোধীদলের প্রস্তাব ছিল, উর্দু এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে গণপরিষদে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। কেননা সমগ্র পাকিস্তানের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-বাংলা কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অতঃপর ২৫শে ফেব্রুয়ারি করাচির গণপরিষদে সেই উত্থাপিত বিল সম্পর্কে আলোচনাকালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, খাজা নাজিমউদ্দিন এবং গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজুদ্দিন খান

এই প্রস্তাবকে তীব্র ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদে সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেন। একই সাথে তারা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দেশপ্রেম ও পাকিস্তানের ঐক্য সম্পর্কে ভীষণভাবে সন্দেহবাদী হয়ে ওঠেন। তাকে অশালীন ভাষায় দোষারোপ করেন।

ধীরেন বাবু বিনয়ের সাথে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, আমি মোটেও প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিনি বরং করেছি এই জন্য যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকে। তাই বাংলা ভাষা অবশ্যই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি রাখে আর সেটা উচিত বটে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী এবং তার অনুচরেরা আর কোনো কথাই শুনতে চান না। তারা সকলে মিলে সদলে তাকে চুপ থাকার আদেশ দিয়ে সগর্জনে ঘোষণা দেন– একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অবশ্যই পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামিক রাষ্ট্রভাষা থাকতে হবে আর সেটি হচ্ছে–উর্দু। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা!

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে হরতাল পালন করে। এই সময়ে শেখ মুজিব ভাষার দাবি নিয়ে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র সহকারে পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয় ঘেরাও করেন এবং সেখানকার সকল কর্মচারীদের হরতাল পালনের আহ্বান জানান। এ সময় পুলিশ আচমকা হামলা চালিয়ে শেখ মুজিবসহ আরো ৬৫জনকে কয়েদ করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সদ্যজাত স্বাধীনতার শুরুতেই একসাথে চলার পথে এই প্রচণ্ড হোঁচটে তারা নিজেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। অতঃপর তারা মনে মনে স্মরণ করে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্ভাবক ও পাকিস্তানের জাতির জনক মি. জিন্নাহ সাহেবকে। কারণ পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দুই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাপনার সর্বসেরা ক্ষমতাধর গভর্নর জেনারেল হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং কায়াদে-ই-মিল্লাত লিয়াকত আলী খাঁনের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা চলত তারই নির্দেশে। গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত হবার প্রস্তুতিকালে মি. জিন্নাহ সাহেব প্রায়ই ঘোষণা দেবার ন্যায় বলে বেড়াতেন– বিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের কথা। ইসলাম ধর্মে আকুণ্ঠ বিশ্বাস, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উন্নতিতে অপরিসীম আশা আর রাষ্ট্রের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য, এটাই হবে তার রাষ্ট্রের মূলনীতি। কিন্তু নির্জলা সত্য ছিল, জিন্নাহ সাহেব মুখে যাই বলুন না কেন, কাজের সময় তিনি এবং তার অনুচরেরা সেইসব প্রতিশ্রুতি বা নীতির কিছুই মেনে চলেন না। তাদের আচার-আচরণ ছিল এক অদ্ভুত গোলকধাঁধায় পরিপূর্ণ যা তাদের ক্ষেত্রেও এক দুর্ভাগ্য বটে।

কেননা মি. জিন্নাহর সৃষ্ট ফ্রাংকেনস্টাইল তারই সম্মুখে তারই নীতিকে ক্রমশ গ্রাস করেছিল। বিশেষ করে তিনি জনসম্মুখে বলতেন, তার পাকিস্তান হবে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সকল নাগরিক ভোগ করবে সমান মর্যাদা। কিন্তু তার দল মুসলিম লীগ মেতে উঠেছিল প্রভূত্বমূলক মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার নেশায়, বর্বরতায়।

১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্টে পাকিস্তানের নব্য-গণপরিষদের উদ্‌বোধন করেন কায়দে আজম জিন্নাহ। সেই গণপরিষদের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী যোগেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল। অনুষ্ঠানের ভাষণে মি. জিন্নাহ বলেন, আপনারা স্বাধীন। আপনারা অবাধে খুশি মতো আপনাদের মন্দির, মসজিদ বা যে-কোনো উপাসনার স্থানে যেতে পারেন। আপনারা যে-কোনো ধর্মের বা বর্ণের লোক হতে পারেন তা সত্ত্বেও আমরা সকলেই একটি মাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের সমান নাগরিক। এই মৌলনীতির সাথে ধর্মগত পার্থক্যের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এখন আমি মনে করি, এই ঐক্যের আদর্শটি আমাদের সামনে রেখে চলতে হবে। তাহলে আমরা কালক্রমে দেখব, হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না মুসলমানও আর মুসলমান থাকবে না। অবশ্য ধর্মীয় অর্থে আমি তা বলছি না।

কারণ ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বস্তু। আমি বলছি রাজনৈতিক অর্থে। অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমান বলে বিবেচিত হবে...

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই বক্তব্য রাখার কয়েক মাস পরে গণপরিষদে বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনার পর পূর্ব বাংলার উত্তেজনার অবসান ঘটাতে জাতির জনক জিন্নাহ সাহেব করাচি থেকে ঢাকায় উড়ে আসেন বিমান যোগে।

এ কারণে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে এবং জিন্নাহ সাহেবের সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ছাত্রদের সাথে চুক্তি করেন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এবং বন্দিদের মুক্তি দেন। মুক্তি পেতেই শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় তাঁরই সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের সভা অনুষ্ঠিত করেন। এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি মিছিল নিয়ে তিনি আইন পরিষদের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এখানেও পুলিশ হামলা চালায়, লাঠিচার্জ করে শোভাযাত্রার অনেককে আহত করে।

এর প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রলীগের একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেন মি. জিন্নাহ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের দাবির প্রতি কোনো বিচার-বিবেচনা না করে বরং প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানের ঘোষণায় জোরালো সমর্থন দিতে গলাখাকারি দিয়ে হুংকার ছেড়ে আশান্বিত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে বলতে থাকেন,... সুতরাং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।...

কাজেই পূর্ব-বাংলার চির-স্বাধীনচেতা অকুতোভয় বাঙালি ছাত্রসমাজ জিন্নাহ সাহেবেরা গর্জনের সাথে সাথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ন্যায়সংগতভাবে তারা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি নিয়ে প্রবল এক আন্দোলন গড়ে তোলে। একই সাথে তারা সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনে বাঙালিদের সম-প্রতিনিধিত্বেরও জোর দাবি জানায়। ব্যাস, এতেই অবাঙাল শাসককুল

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে দ্বিধাহীন চিত্তে চালাতে শুরু করে দমননীতি। ফলে শুরু হয়ে যায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। আর সেই দিনেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এরপর তিনি মুক্তি লাভ করার পর থেকে পুনরায় সরকার বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা নিজেদের বিভিন্ন দাবিতে হরতাল পালন করে। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুসলিম লীগ সরকারের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো ২৭জন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার ও জরিমানা করে (১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং সে বছরের শেষভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন)।

এই ঘটনায় অনেক ছাত্রনেতা পরবর্তী সময়ে আত্মসমর্পণ করে পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যায়। কিন্তু আপোষহীন শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় ও অন্যায্য আদেশের কাছে মাথা নোয়াননি। অর্থাৎ তিনি জরিমানা ও মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। কাজেই এখানেই তাঁর আইন পড়ার ব্যাপারটা চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, (বহিষ্কারের দিনে) তিনি এক যথার্থ আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠকণ্ঠে বলেছিলেন– 'আমি আবার একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবোই, তবে হয়ত ছাত্র হিসেবে নয়...'

১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে মুসলিম লীগ সরকারের জুলুমের প্রতিবাদে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এই সময় থেকে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ সরকারের সকল অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কারণ বহুকাঙ্ক্ষিত মুসলিম লীগ যা-সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন পাকিস্তান কিন্তু তারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সম্পূর্ণভাবে এক চরম ধোঁকাবাজির মধ্যে ফেলে নিষ্পেষিত-নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা পূর্ব বাংলাকে নিজেদের কলোনি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। আর এখানকার অধিবাসীদের মনে করত অনভিজাত-অমুসলিম।

এ কারণে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের প্রাককালে (১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল) যেখান থেকে বিরোধী দলের প্রার্থী হন শামসুল হক, শেখ মুজিব তাঁর সহযোদ্ধা এবং ছাত্রদের নিয়ে তার পক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান চালান। আর উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সেই নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের শামসুল হক নির্বাচিত হন।

বাঙালির বিজয়কে তিনি এভাবেই বয়ে আনতে থাকেন, যেন খুব সংগোপনে সবার অজান্তে-অজ্ঞাত সরে, ধীরে ধীরে। এই ঘটনায় টনক নড়ে মুসলিম লীগ সরকারের এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের। আর বলাবাহুল্য, এই ঘটনার বহু বছর পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এরাই এবং এদের মদদে সৃষ্টি হয় চরম এক সন্ত্রাসী পোশাকি বাহিনী, রাজাকার-আলবদর-আলশামস। কারণ ধর্মান্ধ মুসলিম সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক নুরুল আমিন গং কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের ফলাফলকে। এজন্য তারা একমাত্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে শেখ মুজিবকে। কারণ নির্বাচনি প্রচার অভিযানকালে তাঁর অসাম্প্রদায়িক বাগ্মি-বক্তৃতায় সাধারণ জনগণ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা নিজেদেরকে জানতে ও চিনতে শুরু করেছিল। তাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হতে শুরু করেছিল। কাজেই তারা এই দূরন্ত বাকপটু এবং জনপ্রিয় উদীয়মান নেতাকে পুনরায় গ্রেফতার করে বসল। তাঁর অপরাধ, কেন তিনি আজ মুসলিম লীগ বিরোধী?

এই সব রাজনৈতিক ঘটনা-দুর্ঘটনা পূর্ব বাংলার শোষিত-নিপীড়িত পক্ষের নেতৃবর্গ ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে উপলব্ধি করেন। এই লক্ষ্যে সে বছরেই (১৯৪৯) ২৩শে জুন ঢাকার রোজগার্টেনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে, শামসুল হক সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক এবং কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবকে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় এবং ৪০ জন সদস্য নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

এই সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক কার্যালয় করা হয়, ৯৮, নবাবপুর এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী মুসলিম লীগের একমাত্র মুখপত্র। আর বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, উক্ত পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিচালনায় শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।

এ বছরের শেষ নাগাদ শেখ মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান। অতঃপর কাল বিলম্ব না করে তিনি (১৭ই নভেম্বর) রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন, যা প্রস্তুত করেছিলেন জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী। এই সময়ে সমগ্র পূর্ব বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষের মহাতাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু মুসলিম সরকার এই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় ছিল চরম উদাসীন এবং সর্বোপরিভাবে ব্যর্থ। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সে সময় শুধুমাত্র খুলনাতেই ২৫ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।

এইসব মর্মান্তিক ঘটনায় হতবিহ্বল শেখ মুজিব ছুটে যান লাহোরে এবং সেখানে অবস্থান করা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সাথে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। অতঃপর জানতে পারেন ১লা জানুয়ারি তারিখে (১৯৫০) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসছেন। এই খবরে উক্ত দিবসে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি ভুখা মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিল যখন রমনা গেটের কাছে পৌঁছে যায় সাথে সাথে পেটোয়া পুলিশবাহিনী ভুখা মিছিলের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। একই সাথে তারা মওলানা ভাসানী, শামসুল হক এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে।

এবারে তারা তাঁকে একটানা দুই বছর অব্দি কারাগারে আটকে রাখে।

> বাঙালির বিজয়কে তিনি এভাবেই বয়ে আনতে থাকেন, যেন খুব সংগোপনে সবার অজান্তে-অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে

'৪৭-এর দেশ বিভক্তির শুরু থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাম রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তেভাগা ও কৃষক আন্দোলন চলতে থাকলে মুসলিম সরকার সেটাকে দমন করতে শত শত কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার শুরু করে। এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অন্যদিকে সরকার সুকৌশলে ঢাকা, বরিশালসহ আরো কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ ভারতে পাড়ি জমায়। বিপরীতে ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা বিহারিরা পূর্ব বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে ঢাকায় আগত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান থাকেন পুরোপুরি উদাসীন। তিনি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগকে আমলে না নিয়ে গণপরিষদে পাকিস্তানের মূলনীতি পেশ করেন; যেখানে সর্বোপরি বাঙালিদের স্বার্থ থাকে উহ্য। ১৯৫১ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলার লবণ শিল্পকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা সফল হয়; ফলে পূর্ব বাংলায় লবণের মূল্য হয়ে ওঠে প্রায় স্বর্ণের দামে, ১৬ টাকা সের দরে। জাতির এই করুণ দশা কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি বন্দি অবস্থায় রাজনীতি থেকে দূরে তো সরেনই না বরং আরো কঠোর এক চেতনায়, অঙ্গীকারে দৃঢ় হন।

যে কারণে তাঁর সৃষ্ট বিরাট সংখ্যক কর্মী বাহিনী অন্যান্য সমমনা দলগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। তাঁকে গ্রেফতারের কারণেই যেন আন্দোলন-সংগ্রামের ব্যাপারটি আরো বেগবান হতে থাকে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নির্যাতন, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কৃত্রিম লবণ সংকট, পশ্চিমা বৈষম্যমূলক শোষণ এবং একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রদানে ব্যর্থ হবার কারণে মুসলিম লীগ সরকার চরমভাবে জনপ্রিয়তা হারায়। আর বলাই বাহুল্য এই অমূল্য সুযোগে সরকারি আমলাগণ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা হরণ করতে সক্ষম হয় যথার্থভাবে। কিন্তু পূর্ব বাংলার এই চলমান কঠিন সংকটেও মুসলিম লীগ সরকার থাকল অবিচল, নির্মম ও উদাসীন। আর সে-কারণে '৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারিতে ঢাকায় বসে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পশ্চিমাদের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে আরো প্রমাণ দিতে ঠিক তার প্রভুদের মতো একই ভাষায় একই সুরে পুনরায় ঘোষণা করে– উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা...।

শেখ মুজিব তখনো কারাগারে দিন অতিবাহিত করছেন। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নানাবিধ নির্যাতন, হয়রানি আর দুর্ভোগ পোহানো জাতির চিন্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারের সাধারণ চিকিৎসাকেন্দ্র তার অসুখ সারিয়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কাজেই সেই ভগ্নস্বাস্থ্যের শেখ মুজিবকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ডে। এই সময়ে নেতাকর্মীরা তাঁকে দেখতে গেলে তিনি তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রেরণা ও দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। আর এই ঘটনা গোয়েন্দা পুলিশের নজরে এলে তারা তাঁকে পুনরায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। আর বলাই বাহুল্য তিনি জেল থেকে বিভিন্ন উপায়ে নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আসন্ন ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সেই সাথে রাজপথের ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্ম প্রকাশ করতে স্বয়ং তিনি এবং বরিশাল নিবাসী মহিউদ্দিন আহমেদ ১৬ই ফেব্রুয়ারি নাগাদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

এ কারণে মুসলিম লীগ সরকার শেখ মুজিবকে দূরে সরিয়ে রাখতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে স্থানান্তর করেন ফরিদপুর কারাগারে। অন্যদিকে রাজপথের ভাষা আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করতে পাকি মুসলিম লীগ সরকার এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা তারা প্রয়োগ করেনি। সেই সাথে তারা মিথ্যে ধর্মীয় ফতুয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না : যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা রাষ্ট্রদোহী তো বটেই; সেইসাথে এটা একটা চরম অনৈসলামিক ব্যাপারও বটে। এইসব বানোয়াট ফতুয়ার মাধ্যমে তারা সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে ভয়ানকভাবে লেলিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের এহেন হাজারো দমননীতি, নিপীড়ন সত্ত্বেও '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে সচেতন বাঙালি ছাত্র সমাজ ঢাকায় এক ঐতিহাসিক গণবিক্ষোভের আয়োজন করে বসে।

ছাত্র সমাজের এই দাবিকে কঠোরভাবে দমন করার নিমিত্তে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী শহরের রাজপথে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সেই গণবিক্ষোভ সমূলে উপড়ে ফেলতে যত্রতত্র অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে। ফলে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে ঢাকার রাজপথে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। ঘটনাস্থলে সালাম, জব্বার, রফিকসহ অসংখ্য ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। বরং তা দাবানলের মতো উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী থেকে মফস্বল শহরে : সেখান থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেই সাথে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশ হয়ে উঠে অশান্ত-উত্তাল। ফলে ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে মুসলিম লীগ সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি আরো প্রচণ্ডভাবে ঘনীভূত হয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে সহসাই যেন জাতীয়তাবাদীর চেরাগটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠে সারা বাংলায়।

এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দানা বেধে ওঠায় এবং নতুন আন্দোলনের পটভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ এবং

সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির জন্য চিন্তা করতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। এবং তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদের সদস্য হওয়ার কারণে ওই বছরেই তাঁকে পিকিং সফরে যেতে হয়।

পরবর্তী বছরে (১৯৫৩) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হলে সেই সভা শেখ মুজিবকে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে। তার পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, শেখ মুজিব তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে সমগ্র পূর্ব বাংলার গ্রামগঞ্জে প্রচার অভিযানে নামেন।

একই সাথে নিজ এলাকার (গোপালগঞ্জ) নির্বাচনি আসন থেকে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াজিদুজ্জামানকে হটিয়ে দিয়ে তিনি আইন সভার সদস্য হিসেবে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন। পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় সূচিত হয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে মূলত বাঙালিদের অধিকার এবং হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছিল। এজন্য নির্বাচনে বাঙালিরা বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের নির্বাচিত করে। কাজেই শেরে বাংলা একে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং তিনি শেখ মুজিবকে তাঁর মন্ত্রিসভার সমবায়, কৃষি ও বন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। এটা ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিলের ঘটনা।

বাঙালির এই অভূতপূর্ব বিজয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ভীত যেন ভূকম্পনজনিত দশায় নড়বড় করে লাফিয়ে ওঠে। অন্যদিকে ছাত্র সমাজের অব্যাহত ভাষা-আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে, পশ্চিমা শোষকরা পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তারা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর ওই একই দিনের গণপরিষদের মাধ্যমে প্রস্তাবটিকে পাস করা হয়।

সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলনের বিষয়টি খুবই ব্যতিক্রমী একটি অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা ভাষা-আন্দোলনের সার্থক সফলতায় পূর্বাঞ্চলের নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে এক সুগভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়। যা থেকে নব প্রজন্মটি ক্রমেই জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ■

---

সিনিয়র সাংবাদিক

# বইমেলার ইতিকথা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

আধুনিক বিশ্বে যত রকম মেলা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো বইমেলা। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ মেলার আয়োজন করা হয়। এসব মেলায় লাখো বইপ্রেমী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে থাকেন। বইমেলা বইপ্রিয় মানুষের প্রাণে দোলা দেয়, অনুরণিত করে তাদের মন-মনন। তেমনিভাবে 'অমর একুশে বইমেলা'– বাঙালির প্রাণের মেলা। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের মেলা। ফি বছর ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলা একাডেমি চত্বর ও তৎসংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত বই বিক্রির মহোৎসবটিই হচ্ছে একুশের বইমেলা। এ বছরের বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, 'পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, খ্রিষ্টীয় পনেরো শতকে জোহানস্ গুটেনবার্গ প্রথম মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা আবিষ্কার করেছেন। বলা হয় সেই সময় থেকেই বইমেলার সূচনা হয় জার্মানিতে। অনেকের মতে, জার্মানির লিপজিগ শহরে প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লিপজিগ খুব বড়ো করে মেলার আয়োজন করায় ওটার নামই লোকজন তখন থেকে জানত বেশি। সে সময় বইমেলাগুলো তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সতেরো শতকের পর ইউরোপসহ বিশ্বের আরো কিছু দেশে বইমেলা শুরু হয়।

তবে ১৮০২ সালে ম্যাথুকেরির উদ্যোগে প্রথম বইমেলার আসর বসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। ১৮৭৫ সালে প্রায় ১০০ জন প্রকাশক মিলে নিউইয়র্কের ক্লিনটন শহরে আয়োজন করে বৃহৎ এক বইমেলার। ওই মেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার বই। ১৯৪৯ সালে শুরু হয় জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে বৃহৎ বইমেলা যা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপ নেয়। সেখান থেকেই আধুনিক বইমেলার শুভযাত্রা। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলায় ২১টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজার প্রকাশক অংশ নেন মাত্র পাঁচ দিনের এই মেলায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে বইমেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকাশনার দিক থেকে লন্ডন বইমেলা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বইমেলার অন্যতম। তবে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার মতো বড়ো না হলেও এ মেলার গুরুত্ব অনেক। সাধারণত বছরের মার্চ মাসে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা

বইমেলা ১৯৮৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বইমেলার স্বীকৃতি অর্জন করে। সারা বিশ্বে এখন অনেকগুলো আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেসব মেলায় বইপ্রেমিদের মিলনমেলা বসতে দেখা যায়। এরমধ্যে অন্যতম বইমেলাগুলো হলো– লন্ডন বইমেলা, নয়াদিল্লি বইমেলা, হংকং বইমেলা, মস্কো বইমেলা, সিডনি বইমেলা, টোকিও বইমেলা, ম্যানিলা বইমেলা, বেইজিং বইমেলা, বুয়েন্স আয়ার্স বইমেলা, জেরুজালেম বইমেলা, তেহরান বইমেলা, আবুধাবি বইমেলা, কায়রো বইমেলা ও বুক এক্সপো আমেরিকা (বিইএ) ইত্যাদি।

আর আমাদের বাংলাদেশে অমর একুশে গ্রন্থমেলা নামে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে চলে আমর একুশে বইমেলা। এই বইমেলার ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো– বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)। এটি ছিল মূলত শিশু গ্রন্থমেলা, যার আয়োজন করেছিলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক প্রয়াত কথাসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দীন। তিনি যখন বাংলা একাডেমিতে চাকরি করতেন তখন একাডেমিতে প্রচুর বিদেশি বই আসত। এরমধ্যে একটি বই ছিল 'ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অব বুক্স'। এই বইয়ে উল্লেখিত 'বুক' এবং 'ফেয়ার' শব্দ দু'টি তাকে আন্দোলিত করে। 'বুক ও ফেয়ার' এই শব্দ দু'টি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সেই শিশু গ্রন্থমেলার যাত্রা শুরু করেন। অনুমান করা হয়, এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। শিশু গ্রন্থমেলার আয়োজন করে তিনি পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারেননি। যার ফলে পরবর্তীতে তিনি আরো বড়ো আকারে গ্রন্থমেলার আয়োজন করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন তিনি। এই মেলায় আলোচনা সভারও ব্যবস্থা ছিল যাতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ। এই বইমেলায় তিনি এক অবিশ্বাস্য মজার কাণ্ড করেছিলেন। পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য মেলার ভেতরে একটি গরু বেঁধে রেখে তার গায়ে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমি বই পড়ি না'। এই ঘটনাটি সে সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং পাঠকদের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল।

১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় চটের ছালা বিছিয়ে তার উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এ ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের শরণার্থী লেখকদের লেখা। এর পেছনে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশে তখন চলছিল যুদ্ধের দামামা। অনেক বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিককে দেশপ্রেমের অপরাধে কারাবাসের শাস্তি দেয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। তখন তারা পালিয়ে শরণার্থী হিসেবে কলকাতায় অবস্থান করেন। সেখানেও নিয়মিতভাবে চলত তাদের সাহিত্যচর্চা। সবাই একত্রিত হতেন জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কবি সৈয়দ আলী আহসানের কলকাতাস্থ অস্থায়ী বাসায়। লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের এই আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সাহাও। নিয়মিত উপস্থিত থেকে দেশের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে তাদেরকে উৎসাহ দিতেন তিনি। নির্বাসিত এই লেখকদের বই প্রকাশ করার দায়িত্বও তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। সে সময় চিত্তরঞ্জন সাহার ভূমিকায় এবং অন্যান্যদের সহায়তায় 'স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ' নামে কলকাতায় একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থাটিই পরবর্তীতে 'মুক্তধারা প্রকাশনী'তে পরিণত হয়। স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে তখন ধীরে ধীরে তাদের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই অর্থাৎ ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমিতে অমর একুশের অনুষ্ঠানে কোনো বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। সেবার একাডেমির দেয়ালের বাইরে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনীর কিছু বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসে কিছু বই বিক্রি করেন। ওই সময় বর্ণমিছিলের প্রকাশক তাজুল ইসলামসহ আরো ৭-৮ জন প্রকাশক একাডেমির

ভেতরে পূর্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে বই সাজিয়ে বসেন।

এবার আসি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা শুরুর ইতিহাস পর্যালোচনার দিকে। ১৯৭২ সালে সুসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দিন যখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, তখন ইউনেস্কো ওই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। গ্রন্থমেলায় আগ্রহী জনাব সরদার এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যহতি পরেই চিত্তরঞ্জন সাহা কলকাতা থেকে সেই লেখকদের কিছু বই নিয়ে আসেন বাংলাদেশে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রাথমিক উপাদান ছিল এই বইগুলো। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এভাবেই বইমেলা চলতে থাকে। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি মেলা উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি মুক্তধারা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো কেউ কেউ বাংলা একাডেমির মাঠে নিজেদের বই বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক বিশিষ্ট কবি ও ফোকলোরবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সক্রিয় ভূমিকায় তিনি বাংলা একাডেমিকে মেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। বাংলা একাডেমির সক্রিয়তার ফলেই সেই বইমেলা আজকের এই গৌরবময় অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৯ সালে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। ওই সময় ৭ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৮১ সালে বইমেলার মেয়াদ ২১ দিনের পরিবর্তে ১৪ দিন করা হয়। এরপর প্রকাশকদের দাবির মুখে ১৯৮২ সালে মেলার মেয়াদ আবার ২১ দিনে বৃদ্ধি করা হয়। তখন মেলার প্রধান উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমি আর সহযোগিতায় ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

## বইমেলায় যাবো

রোমানুর রোমান

ও দাদুভাই মেলায় যাব
কিনব ছড়ার বই,
কোথায় তুমি! একটু চলো
শুনছ তুমি কই!
মেলায় নাকি নতুন নতুন
বই- মানুষের থৈ
ছন্দ তালে পড়ার মজা
বইটা খুঁজে লই।
রসের কথা গল্পে আছে
পড়ব মিলে সই,
দেখব ঘুরে মেলায় গিয়ে
কিনব নানান বই।

১৯৮৩ সালে কবি মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সে বছর মেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। মূলত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের নিদারুণ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই এই মেলার নামকরণ হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' যা নিয়মিতভাবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ২০১৪ সাল থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি চত্বর ছাড়াও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এক মাসব্যাপী একুশে বইমেলা আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করছে। পৃথিবীতে আর কোনো বইমেলাই দীর্ঘ এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় না বলেই আমরা জানি। এদিক থেকে দেখতে গেলে এটি পৃথিবীর দীর্ঘদিনব্যাপী আয়োজিত একটি বইমেলা। ■

কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক

# যার হাত ধরে বইমেলা

মো. মনজুর হোসেন পাটোয়ারী

দেশের সবচেয়ে বড়ো, ঐতিহ্যবাহী মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা। বইপ্রেমী, লেখক, সাহিত্যিক ও প্রকাশকের মিলনমেলা। যার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে সবাই। বইপ্রেমিরা মুখিয়ে থাকে প্রিয় বইটি কেনা, প্রিয় লেখকের সঙ্গে দেখা করা, অটোগ্রাফ নেওয়া, আরো কত কি। দিন যত যাচ্ছে, বাড়ছে এ মেলার প্রসারতা ও জনপ্রিয়তা। বন্ধুরা, এ মেলাটি কিন্তু একদিনেই গড়ে ওঠেনি। রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। যার হাত ধরে এই বইমেলা শুরু হয়েছে তারই কথা তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম–

চিত্তরঞ্জন সাহা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক। ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম কৈলাশ চন্দ্র সাহা এবং মায়ের নাম তীর্থবাসী সাহা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তবে তিনি ১৯৪৩ সালে মোহাম্মদপুর রামেন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৮ সালে চৌমুহনী এসএ কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন।

তিনি ছিলেন পুরনো ঢাকার বাসিন্দা। তাদের পরিবারের আদি ব্যাবসা ছিল কাপড়ের ব্যাবসা। কিন্তু তিনি পারিবারিক কাপড়ের ব্যবসায় নিয়োজিত হননি। তিনি নোয়াখালীর চৌমুহনীতে স্কুলের পাঠ্যবই ও নোট বই নিয়ে শুরু করেন পুস্তকের ব্যাবসা। এর কয়েকদিন পর বাসন্তী প্রেস নামে একটি ছাপাখানা ক্রয় করেন। পরে নাম বদলে রাখেন ছাপাঘর । এ নামে একটি পুস্তক বাঁধাই প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ব্যাবসা সম্প্রসারিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা প্রেস নামে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। আরো প্রতিষ্ঠা করেন 'গ্রন্থঘর' নামে একটি বইয়ের দোকান। এরপর ১৯৬৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন পাঠ্যপুস্তক ও নোটবইয়ের প্রকাশনা সংস্থা পুঁথিঘর লিমিটেড ।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে স্বপরিবারে আগরতলায় চলে যান। কলকাতায় অবস্থান করা বাঙালি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে উদ্যোগ নেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বই প্রকাশের। নাম দেওয়া হয় 'মুক্তধারা'। এখান থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের শরণার্থী লেখকদের ৩২টি বই । এই বইগুলো ছিল বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অভিব্যক্তি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে চিত্তরঞ্জন সাহা বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। তিনি বর্তমান বাংলা একাডেমি (তৎকালীন বর্ধমান হাউস) প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চট বিছিয়ে তার ওপর ৩২টি বই দিয়ে শুরু করেন বইমেলা। চিত্তরঞ্জন সাহার প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনীর নাম ছিল স্বাধীন বাংলা

সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান নাম মুক্তধারা প্রকাশনী)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা নিয়ে বই বের হতো কলকাতা থেকে। তাঁর এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সালে তিনি একাই এই বইমেলা চালিয়ে যান । অন্যরা তাতে যোগ দেন ১৯৭৬ সালে। দুই বছর পর ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। পরের বছর ১৯৭৯ সালে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতাও চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন করেন।১৯৮৪ সালে বড়ো পরিসরের বাংলা একাডেমি চত্বরে অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। একটি চটের উপর ৩২টি বইয়ের মেলা আজ লাখো বইয়ের মেলায় পরিণত হয়েছে। তাই তো ২০১৪ সাল থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে মেলার পরিধি।

সমাজসেবক এবং গ্রন্থ প্রকাশনা জগতে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ২০০৫ সালে চিত্তরঞ্জন সাহা একুশে পদকে ভূষিত হন। প্রকাশনা শিল্পে আবদানের জন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। সর্বপ্রথম বইমেলাকে সম্মান জানিয়ে ২০১০ সাল থেকে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' নামক একটি পদকের প্রবর্তন হয়, যা আগের বছরে প্রকাশিত বইয়ের গুণমান বিচারে সেরা বইয়ের জন্য প্রকাশককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০০৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন সাহা পরলোক গমন করেন। জন্মস্থানেই তার শেষকৃত্য করা হয়। ভাষার মাসে সব ভাষাশহিদদের জন্য এবং বইমেলার প্রবর্তক চিত্তরঞ্জন সাহা'র প্রতি রইল অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ■

---

প্রাবন্ধিক ও কর্মকর্তা, আইটি কোম্পানি

# ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আব্দুস সালাম

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হয় যদি
বাঙালিদের সকল কাজে হবেই তখন ক্ষতি।
ফরম হবে উর্দুভাষায় করতে হবে ফিলআপ
মানি অর্ডার করতে গেলেও করবে সবাই বিলাপ।

মাতৃভাষা বাংলা যাদের উর্দু জানে কমই
কেমন করে রাখবে বুঝে ভিটেমাটি জমি।
মাতৃভাষা ছাড়া কি আর সঠিক হবে শিক্ষা?
বাঙালিরা নিঃস্ব হয়ে করবে তখন ভিক্ষা!

রাষ্ট্রভাষার সুফল কুফল নানান রকম তত্ত্ব
পরিষদে বলেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
বাঙালিদের ক্ষতি হবে, ভাষার হবে কী যে!
তাই প্রতিবাদ করেছিলেন ধীরেন বাবু নিজে।

বাঙালিদের জেগে ওঠার বীজ করেছেন বপন
পাকশাসকও বুঝেছিল ধীরেন বাবুর স্বপন।
শাসকগোষ্ঠী বলল তাকে ভারতীয় চর
করবে প্রমাণ ভাঙবে বাবুর বাংলা ভাষার স্বর।

বুকে রাখে কূটকৌশল লিয়াকত আলী খান
ধর্ম রক্ষার কথা বলে উর্দুভাষাই চান।
হায় বাঙালি সদস্যরাও ছিল না তার পক্ষে
ওরা ছিল ভীষণ ভীরু নেই যে সাহস বক্ষে।

কুমিল্লার সেনানিবাসে কেউ তো নেয়নি খোঁজ
একাত্তরে ধীরেন বাবু হলেন যে নিখোঁজ।
নির্যাতনে কেড়ে নিল ধীরেন বাবুর প্রাণ
যায়নি বৃথা বাংলা ভাষা তারই অবদান।

# বাংলা ভাষাই চিহ্ন

আবু নাসের সিদ্দিক তুহিন

কথার কপটতার কপাট খুলে
বলছে যারা কথা
নিছক মেলামেশা ফন্দিফিকির
যাচ্ছে যথাতথা।

হিজল বনের বাকল ছাড়ানো
চিত্তের ম-ম গন্ধে
সকালে এখানে বিকেলে ওখানে
বেলির দুয়ারে সন্ধ্যে।

নাইট কুইন হাসনাহেনাদের
বাড়ির গেটেই তালা
পথঘাটের রাস্তা মাড়িয়ে
বাড়ছে প্রীতির জ্বালা।

কেওক্রাডং নিঝুম দ্বীপে
সন্ন্যাসী রয় একা,
আকাশ বাতাস সাক্ষী রেখে
সাগর পাড়ে দেখা।

বচন খুলে পচন কথাতে
মহেশখালীর পান
সুরের মাধুরি বাংলার টানে
ইচ্ছে কবির গান।

বাচনভঙ্গির, বচনকথাটা
বচনভঙ্গি মুখে
একটা পৃথিবী ধ্বংস করে
রয় না মানুষ সুখে।

বদলা নিতে সাধ্যমতোই
স্বপ্নের জাল তৈরি
প্রত্যয়ে আজ সানাই বাজে
ললাট,কপাটে বৈরী।

শুদ্ধ স্বরের কপাল খুলেছে
ভাষা হয়েছে ভিন্ন
ভাষার মাসে আষাঢ় শ্রাবণ
বাংলা ভাষাই চিহ্ন ।

# বাংলা ভাষা

আ. শ. ম. বাবর আলী

বাংলা ভাষা তোমার আমার
বাংলা ভাষা তার,
বাংলা ভাষায় রবি পেলেন
নোবেল পুরস্কার।

বাংলা ভাষায় গল্প শুনি
মনের কথা লিখি,
এই ভাষাতে দেশকে আমার
বাসতে ভালো শিখি।

এই ভাষারই লোককাহিনি
মুর্শিদি আর জারি,
আমার জাতির প্রাণ যে এসব
ভুলতে কী তা পারি?

বাংলা ভাষার জন্য যারা
করল জীবন দান,
যায় কি ভোলা সেই ভাইদের
অশেষ অবদান?

# বর্ণমালা

শাহরিয়ার শাহাদাত

এই তো আমার বর্ণমালা
আত্মত্যাগের ফল
মায়ের ভাষায় মনের কথা
বলছি অনর্গল।

বর্ণমালা বুকপকেটের
জোনাক জ্বলা বাতি
খুব সহজে মায়ের ভাষা
পাইনি রাতারাতি।

রক্তঝরা মিছিল স্লোগান
তাজা রক্তের দামে
দামাল ছেলে বুক পেতেছে
বাংলাদেশের নামে।

শিশুর মুখে অ আ ক খ
দরদ মাখা ঠোঁটে
স্বর্ণালি রুপ বর্ণমালা
ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

শিখছি লিখছি মায়ের ভাষা
স্বাধীন সুখে হেসে
গর্বে বাঁচি মায়ের ভাষায়
সোনার বাংলাদেশে।

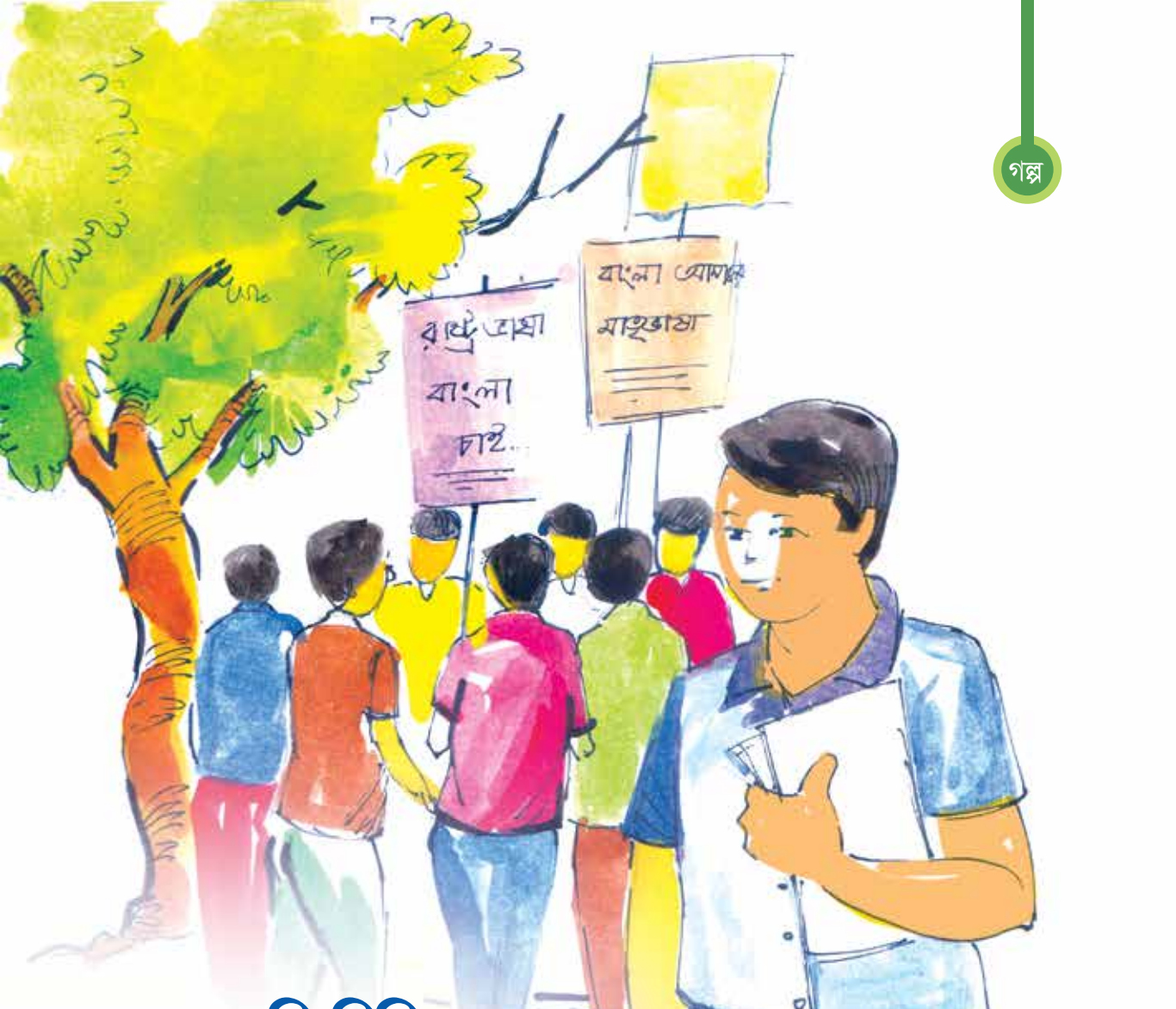


# অগ্নি মিছিল

মমতাজ আহাম্মদ

সারা শহর ফুঁসছে। অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বাঙালি। ঘরে ঘরে প্রতিবাদ, পথে পথে মিছিল। শাসকদের অন্যায্য অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে বাংলার ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ। শাসকের দাবি উর্দু হবে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় ভাষা। কিন্তু তাদের সেই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে ছাত্রসমাজ। তারা নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের মুখে ফুটছে গুলির চেয়েও ভয়ংকর শক্তিশালী

একটি কথা, তা হলো রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। বীর বাঙালির প্রতিবাদের সেই ভাষা শাসকের বুকে যেন তীরের চেয়েও ভয়ংকর গতিতে আঘাত হেনেছে। তারা বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের উপর চলছে দমন-পীড়ন-অত্যাচার।

আজ ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ।
কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বারেকের। মুখের উপর থেকে কাঁথা সরিয়ে পিটপিট করে বাইরে তাকালো সে। বস্তি ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্যের আলো দেখছে সে। বারেক মাঝেমাঝেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। তার বাবা দিনমজুরের কাজ করে। মা মানুষের বাসাবাড়িতে কাজ করে। অভাব-অনটন দেখে দেখেই বড়ো হয়েছে বারেক। তাই বারেক স্বপ্ন দেখে সে অনেক পড়াশোনা করেছে, পড়াশোনা করে সে অনেক বড়ো মানুষ হয়েছে। সে অনেক বড়ো কাজ করে। তাদের আর কোনো অভাব নেই। তার বাবা-মা আর কাজ করে না। কারণ বারেক এখন অনেক টাকা আয় করে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে বারেকের সেই স্বপ্নও ভেঙে যায়। স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে বারেকের। তাই সে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

গতকাল রাতে বারেক যখন শুয়েছিল তখন বাবা আর মায়ের কথা তার কানে এসেছিল। তার বাবা বলছিলেন, কারা নাকি তাদের মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়। সেই কথা শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল বারেকের। সে আঁতকে উঠেছিল, হায় হায়! তার বাংলা ভাষা কাইড়া নিলে সে কথা বলবে কেমন করে? কোন ভাষায় সে কথা বলবে? মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায় এ আবার কেমন জালিম? বারেক এতশত বোঝে না কিন্তু এই কথা বোঝে যে মুখের ভাষা কাইড়া নেওয়া ভীষণ অন্যায়। যারা এ কাজ করতে চায় তারা খুবই অন্যায় করছে। প্রতিবাদে মনে মনে বারেকও ফুঁসতে থাকে। তার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল সেও প্রতিবাদী মিছিলে অংশ নেয়। সেও শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

বারেক উঠে পড়ে। আজ আর স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে না। তবে তার চোখে-মুখে আজ অন্য এক স্বপ্ন খেলা করছে। এ স্বপ্ন মায়ের মুখের স্বপ্ন, এ স্বপ্ন মায়ের মুখের ভাষার স্বপ্ন। সে দেখছে যারা বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বাংলার প্রতিবাদী মানুষের কাছে তাদের পরাজয় হয়েছে। অবশেষে তারা মেনে নিয়েছে এদেশের মানুষের দাবি। নিজের অজান্তেই বারেকের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক চিলতে হাসি।

বাবা-মা কাজে চলে গেছে। বারেকের ইশকুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সে হাতমুখ ধুয়ে মায়ের রেখে যাওয়া পান্তা ভাত খেয়ে নিল। তারপর বইখাতাগুলো বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়ল পথে। তার ইশকুল একটু দূরেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা পার হয়ে তাকে যেতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় ঢুকে পড়ল বারেক। দেখল সেখানে চাপা একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। থমথমে পরিবেশ। কারো মুখে হাসি নেই। এখানে সেখানে দলে দলে জটলা করছে ছাত্ররা। চাপা উত্তেজনায় ফুঁসছে তারা। বারেক তার নিজের স্বপ্নের ছবিগুলো ওদের চোখেমুখে দেখতে পেল। তার খুবই ভালো লাগল সেই দৃশ্যটা দেখে। সে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু পরই এক স্থানে বেশ বড়োসড়ো একটা জটলা শুরু হয়ে গেল। তাদের হাতে বাঁশের চাটাই দিয়ে বানানো কয়েকটা জিনিস দেখতে পেল বারেক। সে পড়তে পারে। বারেক পড়তে লাগল তাতে কী লেখা আছে তা। একটাতে লেখা, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, আরেকটাতে লেখা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, অন্য আরেকটাতে লেখা, মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।

এইসব দেখতে দেখতে বারেকের মনটাও কেমন যেন হয়ে উঠল। সবার সাথে সেও প্রতিবাদী হয়ে উঠল। তার চোখেমুখেও ফুটে উঠতে লাগল আগুনের ফুলকি। প্রতিবাদী বারেক বুকের সাথে আরো ভালোভাবে চেপে ধরে রাখল তার বইখাতাগুলো।

অনেক মানুষ একত্রিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। বারেক বুঝল এরা সবাই ছাত্র। তাদের সাথে কিছু সাধারণ মানুষও আছে। তারা চিৎকার করে

বলছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই। আর সহস্র কণ্ঠে গর্জে উঠছে সেই কণ্ঠ ছাপিয়ে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে।

বারেকও মিশে গেল সেই মিছিলে। মিছিল এগিয়ে চলল। আর জনতার ঢল নামল। বারেক মিছিলের পুরো ভাগে ছিল। সেও সোচ্চার হয়ে উঠল মিছিলের স্লোগানে।

এমন সময় দেখা গেল দূরে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। একজন ছাত্র এগিয়ে এসে বারেককে বলল, তুমি ছোটো মানুষ, পিছনে যাও।

কিন্তু বারেকের পিছনে যেতে ইচ্ছে করছে না। সে তাদের সাথেই থাকতে চায়। মায়ের ভাষার জন্য লড়াইয়ে সেও অংশ নিতে চায়। আরেকজন এসে বারেককে টেনে মিছিলের শেষ দিকে নিয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারেক সেখান থেকেই এগিয়ে গেল সেই মিছিলের সাথে।

মিছিল বাধভাঙা স্রোতের মতো এগিয়ে চলছে। তাই দেখে টনক নড়ল পুলিশের। তারা নড়তে চড়তে শুরু করেছে। তাদের হাতের রাইফেল রক্তলোলুপ সরিসৃপের মতো তাকিয়ে আছে ধাবমান মিছিলটার দিকে। পুলিশের সেই অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করেও এগিয়ে চলল ছাত্র-জনতার মিছিল। সবার চোখেমুখেই খেলা করছে অন্য এক আগুন। এ আগুন নিভাতে পারে পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই। সে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ভয় পেয়ে গেল পুলিশও।

এক সময় তারা নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর কাপুরুষের মতো গুলি করতে শুরু করল। অকুতোভয় বাংলার বীর বাঙালি দামাল ছেলেরা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাংলার জমিন লাল হয়ে গেল ওদের রক্তে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মিছিলকারীরা। বারেকের হাত ধরে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছে এক ছাত্র।

বারেকের চোখে জল। আহা তার কয়েক ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে রাজপথে। তারা ভাষা লড়াইয়ের প্রথম শহিদ। বারেকের ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাদের, কিন্তু ছেলেটা তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। বারেক ছুটে যেতে পারল না। তবে বারেকের স্বপ্নটা আরো বড়ো হতে লাগল। সেই স্বপ্নটা পাখা ছড়িয়ে উড়তে শুরু করল। সে যেন এক আগুনের পাখি হয়ে গেছে। তার নিঃশ্বাসে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। আর সেই আগুনে সে মায়ের ভাষার সমস্ত শত্রুদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চাইল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হলো। রচিত হলো রক্তস্নাত অনন্য এক ইতিহাসের। মায়ের মুখের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে বীর বাঙালি প্রমাণ করে দিলো মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত পবিত্র, কত ভালোবাসার, কত কাঙ্ক্ষিত। ■

গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

গল্প

# একুশ, মাতৃভাষা ও মায়ের গল্প

বশিরুজ্জামান বশির

প্রায় তিন বছর হলো নানার মুখ দেখে না রাতুল, তাই মায়ের কাছে রাতুলের খুব বায়না নানাকে দেখার। অনেকদিন মাকে বলার পর, রাতুলের মা সন্তানের খুশির জন্য তার নানাকে চিঠি ও ফোন করে আসতে বলে। নানা আর দেরি না করে সাথে সাথে চলে আসেন। গ্রাম থেকে হাঁস, মাছ, নারিকেল, লাড়ুসহ রাতুলদের ঢাকার বাসাতে বেড়াতে আসেন। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হলো তিনি এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রাতুল তার নানাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারেনি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানাকে ঘুরিয়ে দেখানো সম্ভব হয়নি। কারণ রাতুল যে-কোনো আনন্দ উৎসবেই শুধু ঘুরতে যায়! লেখাপড়া ফেলে বাবা-মা ছাড়া কোথাও ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগে না। তাই নানাকে রাতুল বলল, নানা তুমি আরও কিছুদিন আমাদের এখানে বেড়াবে। নানা রাতুলের কথা শুনে বলল, কোনো অনুষ্ঠান আছে নাকি নানাভাই? রাতুল তখন নানাকে বলল, হ্যাঁ নানা। অনুষ্ঠান আছে, স্কুলও বন্ধ থাকবে। কেন তুমি জানো না? একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আর

এই মাতৃভাষা দিবসে আমাদের স্কুলসহ অনেক জায়গায় অনুষ্ঠান হবে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানসহ সারা দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান। তাই তো নানা তোমাকে নিয়ে সকালে আমাদের স্কুলে যাব। তারপর বিকালে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। এই কারণেই তোমাকে আরও কয়েকদিন থাকতে হবে। নানা জেনেও না জানার ভান করে বলল, দাদুভাই-মাতৃভাষা দিবস কী? তখন নানাকে রাতুল বলল, কেন তুমি জানো না? সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরও কত লোক বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন। আর তাদের জন্যই তো আজ তুমি, আমি ও আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। আর এই বাংলা ভাষাকেই বলা হয় মাতৃভাষা। আমার মায়ের এই মাতৃভাষাকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবেই পালন করা হচ্ছে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি। এইবার বুঝলে তো নানা? নানাও রাতুলের বুদ্ধি যাচাইয়ের জন্য না জানার ভান করল। তারপর নানা রাতুলকে বলল, দাদুভাই তোমার মাথায় তো খুব বুদ্ধি আছে। তা তুমি এত কিছু কীভাবে শিখলে? তখন নানাকে রাতুল বলল– নানা আমরা স্কুলে যেসব বই পড়ি সেইসব বইয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে লেখা আছে আমরা কীভাবে মাতৃভাষা পেলাম। মাতৃভাষার জন্য কারা শহিদ হয়েছেন– এই বিষয়গুলো আমি বইয়ের মধ্যে পড়েছি।

বাবা-মায়ের কাছ থেকেও শিখেছি। তারপর নানাকে বলল, তুমি কি বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু জানো না? নানা বলল, আমি তো লেখাপড়াই জানি না, কীভাবে জানব? ওই সময় আমরা কোনো স্কুল-কলেজে যাইনি। আমাদের সময় শিক্ষিত লোক খুব কম ছিল। তবুও আমি যতটুকু জানি তা তোমাকে অবশ্যই শোনাবো। যাতে করে তোমার মাতৃভাষা সম্পর্কে তোমার জানার আগ্রহ বাড়ে।

রাতুল বলল, তাহলে নানা আমাকে এখনই বলো তুমি কী জানো? নানা তার একমাত্র নাতি রাতুলকে বলল, শোনো দাদুভাই তোমাকে বলছি একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে হলো– বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। বাঙালির মধ্যে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপলক্ষ উদ্‌যাপন ও ভাষার উন্নয়নের কাজ করার মানসিকতা তৈরিতে এ আন্দোলনের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা দিবস' বা 'শহিদ দিবস' এবং একই সাথে একটি রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসটি আরো নানাভাবে উদযাপিত হয় যার মধ্যে আছে– দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে। অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌যাপন, যা 'অমর একুশে বইমেলা' নামে সমধিক পরিচিত। এছাড়াও ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের ত্যাগের সম্মানে এ মাসেই ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পদক 'একুশে পদক'। মানুষের ভেতর একুশের আবেগ পৌঁছে দিতে একুশের ঘটনা ও চেতনা নিয়ে রচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কবিতা ও চলচ্চিত্র। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য– আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত ও আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সূচিত হয়ে আসছে। রচনাগুলোর মধ্যে–শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক কবর; কবি শামসুর রাহমান রচিত কবিতা বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯; জহির রায়হান রচিত উপন্যাস একুশে ফেব্রুয়ারি; বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান রচিত আর্তনাদ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ভাষা শহিদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে স্থাপিত মোদের গরব ভাস্কর্য। ১৯৫৩ সাল থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন প্রত্যুষে সর্বস্তরের মানুষ খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে এবং শহিদমিনারে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। সারাদিন মানুষ শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো ব্যাজ ধারণ করে। এছাড়া আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তর্পণ করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করা হয়।

আমি যতটুকু জানি তা তোমাকে বললাম এবং বাংলা ভাষার জন্য যে সকল লোক প্রাণ হারিয়েছে, সেই সকল শহিদদের বেশি করে জানার জন্য তোমার কথা মতো আরও কয়েকদিন বাসায় থাকব। তোমাদের এখানে থেকে আ-ম-রি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করব এবং তোমাকে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াবো। নানার এই সব কথা শুনে রাতুল খুশিতে ডগমগ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে নানার কপালে একটা চুমো দিয়ে মায়ের কাছে ছুটে যায়। মাকে বলে, মা নানা ভাষা দিবস নিয়ে আমাকে যে গল্প শোনালো তাতে অনেক কিছু জানলাম। নানা আমাকে নিয়ে মাতৃভাষা দিবসের দিন পুরো ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াবে। ■

---

কবি-সাহিত্যিক

# বাংলা আমার মায়ের ভাষা

মো. জাহাঙ্গীর আলম

জন্ম থেকেই বাংলা শুনি
বাংলা ভাষায় হৃদয় বুনি
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার স্বপ্ন আশা।

বাংলা আমার ছন্দ তানে
বাংলা আমার গানে গানে
বাংলা ভাষায় কথা বলে
আমার দেশের শ্রমিক চাষা।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বাংলা আনে রক্ত ঢেলে
বাংলা ভাষায় রেখে মায়া
তাদের প্রতি রইল দোয়া।

বাংলা ভাষায় শিশু দোলে
বাংলা মায়ের কোলে কোলে
বাংলা ভাষায় কথা বলে
দূর হয়ে যায় সব হতাশা।

বাংলা ভাষায় কথা বলি
বাংলা মায়ের পথে চলি
বাংলা ভাষায় কাব্য আঁকি
বাংলা আমার ভালোবাসা।

# বঙ্গবন্ধু ও বুলেটবিদ্ধ বই

শামীম আজাদ

একজন দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে তিনি যতটা বড়ো ছিলেন, তার চেয়েও বড়ো ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে। একজন আর্দশ মানুষ হিসেবে গড়তে হলে বই হলো উত্তম বন্ধু। যা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। শুধু জীবনের নয় মৃত্যুতেও তাঁর সাথি ছিল বুলেট বিদ্ধ বই ।

শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর ছিল অসম্ভব বইপ্রীতি । ছিলেন বইয়ের সর্বভূক পাঠক। যখনই অবসর পেতেন বইয়ের বিচিত্র জগতে হারিয়ে যেতেন। তা তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র আর 'অসমাপ্তআত্মজীবনী' থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে সময় পেলে কলমও ধরতেন। বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ জীবদ্দশায় দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছিল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দ বাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত ছোটোকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম। বই কেবল শেখ মুজিবের মুক্ত জীবনেরই সঙ্গী ছিল না জেল বন্দি নিঃসঙ্গ জীবনেও বই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। ২১ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালে ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে বঙ্গবন্ধু একটি চিঠি লিখেছিলেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। সেই চিঠিটি তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেই ঐতিহাসিক চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে জেলের নিঃসঙ্গ জীবনে বইয়ের সান্নিধ্য পেতে বঙ্গবন্ধু কতটা উদ্গ্রীব থাকতেন। চিঠিতে আছে- 'Last October when we met in the Dacca Central Jail gate, you kindly promised to send some books for me. I have not yet received aû book. You should not forget that I am alone and books are the only companion of mine.' [সূত্র : মোনায়েম সরকার : বাঙালি শ্রেষ্ঠ বঙ্গবন্ধু, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৫৬]

*শেখ মুজিব আমার পিতা* 'শীর্ষক গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার বই পড়ার অভ্যাস সম্পর্কে লিখেছেন, 'আব্বার কিছু বইপত্র, বহু পুরোনা (পুরনো) বই ছিল; বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলো সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বইছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানার বই বেশিরভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন কিন্তু আমার মার অনুরোধে এ বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলি, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নার্ড শ'র কয়েকটি বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল।'

শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, ফরাসি লেখক এমিল জোলার উপন্যাস *তেরেসা রেকুইন* পড়ে তাঁর উপলব্ধি ছিল 'এমিল জোলার লেখা তেরেসা রেকুইন পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই-তিন ঘণ্টা সময়।'

বিচিত্র বিষয়ের বইয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিপ্লবী সাহিত্য বিশ্বরাজনীতির নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি। পাঠ্য তালিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠকবি-সাহিত্যিকদের বই ছিল প্রথম সারিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি লেখায় যায় সেই লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন–

'ছয়-দফা দেওয়ার পর অনেক সোনা-রুপার নৌকা, ৬-দফার প্রতীক প্রায় ২-৩শ ভরি সোনা ছিল। এগুলো আমার ঘরের স্টিলের আলমারিতে রাখাছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্য আফসোস নেই, আফসোস হলো বই। আব্বার কিছু বইপত্র, বহু পুরোনো বই ছিল। বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলো সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ... জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে গেলে সিলমারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলোতে ছিল। মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলো এনেছেন কিনা। ... সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলো ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ওই বইগুলোর জন্য, যা ঐতিহাসিক দলিল হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে সবই হারালাম।' [ সূত্র : শেখহাসিনা : শেখ মুজিব আমার পিতা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৭০-৭১]

একটু খেয়াল করলে বুঝাযায়, শেখ মুজিব যা কিছু ভালোবাসতেন তাঁর অনাকাক্ষিত হত্যাকাণ্ডের পরে সেসব কিছুও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর দেহ যেভাবে বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, তার বইগুলোও ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল ঘাতকের বুলেটের আঘাতে। বইগুলোও বুলেটের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পায়নি। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা সেই কথাটি লিখতেও ভুল করেননি। তিনি লিখেছেন–

'এই বাড়িটি [৩২ নম্বরের বাড়ি] যখন ১২ জুন, ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হলো তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকামাকড়ে ভরা। ঘরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি, কাচভাঙা, বইগুলো বুলেট বিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতরে এখনো বুলেট রয়েছে। একটা বই, নাম 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'। বইটির ওপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভেতরে একখানা আলগা ছবি, একজন মুক্তিযোদ্ধার- বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতবিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের ওপর গুলি। ঠিক ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয়, তাহলো ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। [প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা : ৭১-৭২]

পড়ার প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অন্য রকম আবেগ। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র অস্তিত্বে যে সাহিত্যিক সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। অনেক কবিতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কারাগারে কাটানো দুঃসময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিপদে মোরে রক্ষা করো/ এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়' গান থেকে সাহস সঞ্চয় করেছেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণেও তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার শেষ দুই পঙ্ক্তি– 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী/রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি।'

বই বঙ্গবন্ধুকে শুধু পাঠক আর বক্তাই হিসেবে গড়ে তুলে নাই। হয়েছিলেন সুদক্ষ বাচিকশিল্পীও । কোথায়, কোন কথা, কীভাবে বলতে হবে তিনি তা আগে ভাগেই বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতা মহাকাব্যের 'মহাকবি', 'পোয়েট অব পলিটিকস'। ■

প্রাবন্ধিক

# আমাদের ভাষা সৈনিক

কামাল হোসাইন

পৃথিবীতে মানুষ ভাষার সাহায্যে একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে। মনের যত রকম আকুলিবিকুলি আছে, সবই প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমেই করে থাকে। বলতে পারি একটা জাতির জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে সেটাই তাদের মাতৃভাষা। যেমন বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজদের ইংরেজি। একজন ইংরেজ তো আর হিন্দিতে কথা বলতে পারে না। ঠিক একইভাবে একজন অ্যারাবিয়ান আরবিতেই কথা বলবে– এটাই স্বাভাবিক। বাঙালির ভাষা তাই বাংলাই হবে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলাই হবে আমাদের মাতৃভাষা। মানে মায়ের ভাষা। প্রাণের ভাষা। বুকের ভাষা। মুখের ভাষা।

কথা বলার ও লেখার এই যে ভাষা, এটা শৈশব থেকে আমরা মায়ের মুখে শুনে শুনে বলতে শিখি। তাই একে বলা হয় মাতৃভাষা। যেমন– যে দেশে আমরা বাস করি, তাকে বলা হয় মাতৃভূমি। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সঙ্গে তাই মানুষের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। অবিচ্ছেদ্য। এ দুটোর মধ্যে এই সম্পর্ক ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি। কারণ, অনেক সময় বসবাসের জায়গা বদলে যায়, প্রয়োজনে নামও পালটে যায় কিন্তু ঠিক থাকে মানুষের একমাত্র ভাষাটাই।

আমাদের প্রাণপ্রিয় এই মাতৃভাষা বাংলা নিয়েও একটা গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এখন আমরা জানব, আমাদের

ভাষা বাংলা নিয়ে কেন ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। বঙ্গদেশও একই সময় একই ভাবে ভাগ হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নামে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটো অংশ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিমে চারটি প্রদেশ– পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। আর পূর্ব অংশে থাকল শুধুই পূর্ববঙ্গ, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নতুন নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

ওই পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকরা শুরু থেকেই বাঙালিকে ভালো চোখে দেখেনি। তাদের প্রতিটি কাজে বাংলা-বিরোধিতা দেখা যায়। এ বিরোধিতা শুরু হয় কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করেই। তারা ঠিক করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে– উর্দু। বাঙালির তাতে আপত্তি। কারণ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ মানুষই বাঙালি। উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহলে শিক্ষা-দীক্ষায়, সরকারি চাকরিসহ নানা ক্ষেত্রে বাঙালিরা পিছিয়ে থাকবে। কোণঠাসা হয়ে পড়বে। আর এটাই তো স্বাভাবিক।

আর এ নিয়ে ষড়যন্ত্র হলো পদে পদে। ষড়যন্ত্র মানে বাংলা ভাষায় কথা বলতে না দেওয়ার পাঁয়তারা। এখানে বলে রাখি, আমাদের এ দেশ একদিন বাংলাদেশ ছিল না। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দেশটি আলাদা একটি লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছিল। আমাদের এ ভূখণ্ডের নাম ছিল তখন পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানিরা শাসক ছিল এ দেশের। তাদের অপর অংশের নাম ছিল– পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে প্রায় হাজার মাইল ভারতের এলাকা। তার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরা ছিল হিংস্র ও স্বার্থপর টাইপের। তারাই পাকিস্তানের কর্তা। তারা পূর্ব-পাকিস্তান মানে, বাংলাদেশের মানুষদের মোটেও সহ্য করতে পারত না। বাংলাদেশে পাট হতো, সেই পাট বিক্রি করে বিদেশ থেকে পাওয়া টাকাগুলো ওরা নিজেদের কাজে ব্যয় করত। বাংলাদেশের মানুষকে বড়ো চাকরিসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো। তাদের ভাষা, তাদের আশা, তাদের চলা, তাদের বলা, স্বপ্ন-সাধ সবকিছু ছিল আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। কারণ, তারা ছিল উর্দু নামের আলাদা একটা ভাষার মানুষ। যেহেতু তারা শাসক ছিল, তাই তারা চেয়েছিল গোটা পাকিস্তানের ভাষা হোক উর্দু, বাংলা নয়। তারা মনেপ্রাণে চাইল রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক উর্দু। আর এ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল পাকিস্তানের সে সময়ের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানেরা।

ভাবো তো একবার, ভাষাই যদি পালটে যায়, তাহলে বাংলাভাষীদের কী হবে? এই অনাচার কি মানা যায়? অসম্ভব। ওদের ওই অনৈতিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শত-হাজার-কোটি বাঙালি-কণ্ঠ 'না না না' বলে তারা যে এটা চায় না, তা বুঝিয়ে দিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে স্লোগান উঠল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আমাদের দাবি মানতে হবে।'

এরপর মাঠেঘাটে, পথেপ্রান্তরে ওই দাবির আওয়াজে ভিনদেশি শাসকেরা ভয় পেয়ে গেল। আর রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ব্যাপারে তারা আরো কঠোর হতে থাকল। শাসকগোষ্ঠীর একদিকে কঠোর মনোভাব, অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কোটি কোটি বাঙালির হার-না মানা সুদৃঢ় প্রত্যয়।

১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালির এ আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯৫২ সালে তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ছাত্ররাই উর্দু ভাষার বিপক্ষে বিক্ষোভ শুরু করে। তবে নীলক্ষেত ব্যারাকের তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরাই প্রথম শহর ঢাকার রাজপথে রাষ্ট্রভাষা ও সবকিছুতে বাংলার দাবিতে মিছিল করেন, স্লোগান দেন। ছাত্ররা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর ছাত্ররাই প্রথম কাতারে এসে শামিল হয়। ঢাকার এই আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের জেলা শহরগুলোতেও আন্দোলন কম হয়নি। ঢাকার আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন চলেছে সবখানে। ঢাকায় এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শামসুল হক, নঈমুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, তাজউদ্দিন আহমদসহ অনেকে। সবখানে অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি শাসকেরা ১৪৪ ধারা জারী করল। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা ওদের

জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি নিলেন। পরিকল্পনা হলো ১০ জন ১০ জন করে একেকটা মিছিল নিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। তারপর চলে চূড়ান্ত মিছিল। দাবির একাট্টা সংগত। সেই দাবির মিছিলে পুলিশ চালালো গুলি। সে গুলিতে ঢাকার রাজপথ রক্তে ভেসে গেল। লাল হয়ে উঠল পিচঢালা পাকা সড়ক। শহিদ হলেন বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালি বীর আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার।

এটা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হন শফিউর রহমান, আবদুল আওয়াল, তাঁতিবাজারের সিরাজুদ্দিন, কিশোর শহিদ অহিউল্লাহসহ অজ্ঞাত আরো মানুষ। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিতে আহত আবদুস সালাম ৭ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। দুনিয়াজুড়ে এমন ইতিহাস আর কোথাও নেই। ভাষার দাবিতে জীবন দেওয়ার এমন ঘটনা বিরল। আর এ অসামান্য ঘটনা যাতে গোটা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে। ১৮৮ ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাসও হয়। সেই থেকে সারা বিশ্বে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এখন আমাদের মহান এ শহিদ দিবস সমগ্র পৃথিবীতে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এটা আমাদের বাংলা ভাষার জন্য, বাঙালি মানুষের জন্য বিরাট সম্মানের ব্যাপার।

আর আমরা সবাই জানি, একুশ মানে মাথা নত না করা। একুশ আমাদের সাহস দেয়। শক্তি দেয়। একুশের কারণেই বাংলাকে আমরা আমাদের করে পেয়েছি। এজন্য আমরা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি এতটা হৃদয় দিয়ে গাইতে পারি। মায়ের ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের কি কখনো ভোলা যাবে? যাবে না। আমরা কখনোই ওই সকল ভাষা শহিদদের ভুলতে পারব না। ■

---

শিশু সাহিত্যিক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

# একুশ মানে

কাব্য কবির

একুশ মানে মায়ের ভাষা
ভাই হারানোর গান,
শত্রুর কাছে হার না মানা
দামাল ছেলের দান।

একুশ মানে রফিক, শফিক
বরকতেরই রক্ত,
প্রাণটা দিলো ভাষার জন্য
আমরা তাদের ভক্ত।

একুশ মানে এগিয়ে যাওয়া
ভয় কে করে তুচ্ছ,
হিমালয়ের মতো মাথা
করে রাখা উচ্চ।

একুশ মানে ভাষার স্মৃতি
মনের মাঝে লালন,
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
শহিদ দিবস পালন।

# প্রভাতফেরি

সোহরাব পাশা

একুশ মানে ছিন্নকরা পায়ের বেড়ি
একুশ মানে নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরি

একুশ মানে লক্ষ প্রাণের একটি আকাশ
একুশ মানে বক্ষজোড়া স্বপ্ন-বিকাশ

একুশ মানে লাল পলাশের উজ্জ্বল দিন
একুশ মানে শহিদস্মৃতি স্বপ্নরঙিন

একুশ মানে স্লোগানমুখর একটি মিছিল
একুশ মানে রাষ্ট্রভাষা দাবির আপিল

একুশ মানে রক্তে লেখা ভালোবাসা
একুশ মানে মায়ের চোখের অশ্রুভাষা।

# ফেব্রুয়ারির স্মৃতি

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা মায়ের মধুর স্বর
নানা রঙে আলোকিত-বর্ণমালার ঘর।
বাংলা আমার মায়ের ধ্বনি চর্যাপদের-সুর
একুশ এলে সেই ধ্বনিতে হৃদয় ভরপুর।

বাংলা আমার মন ভোলানো বেউল্যা বিবির গান
সাগর-নদীর ঝরনাধারার বিপুল কলতান।
বাংলা আমার-রবি-দুখুর হাজার গল্প-গাথা
ছন্দ-মিলে প্রাণের পরশ ভোলায় দুঃখ ব্যথা।

বাংলা আমার শহিদমিনার একাত্তরের গীতি
শিমুল-পলাশ জাগায় মনে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি।

গল্প

# বর্ণবাড়িতে আদনান

মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

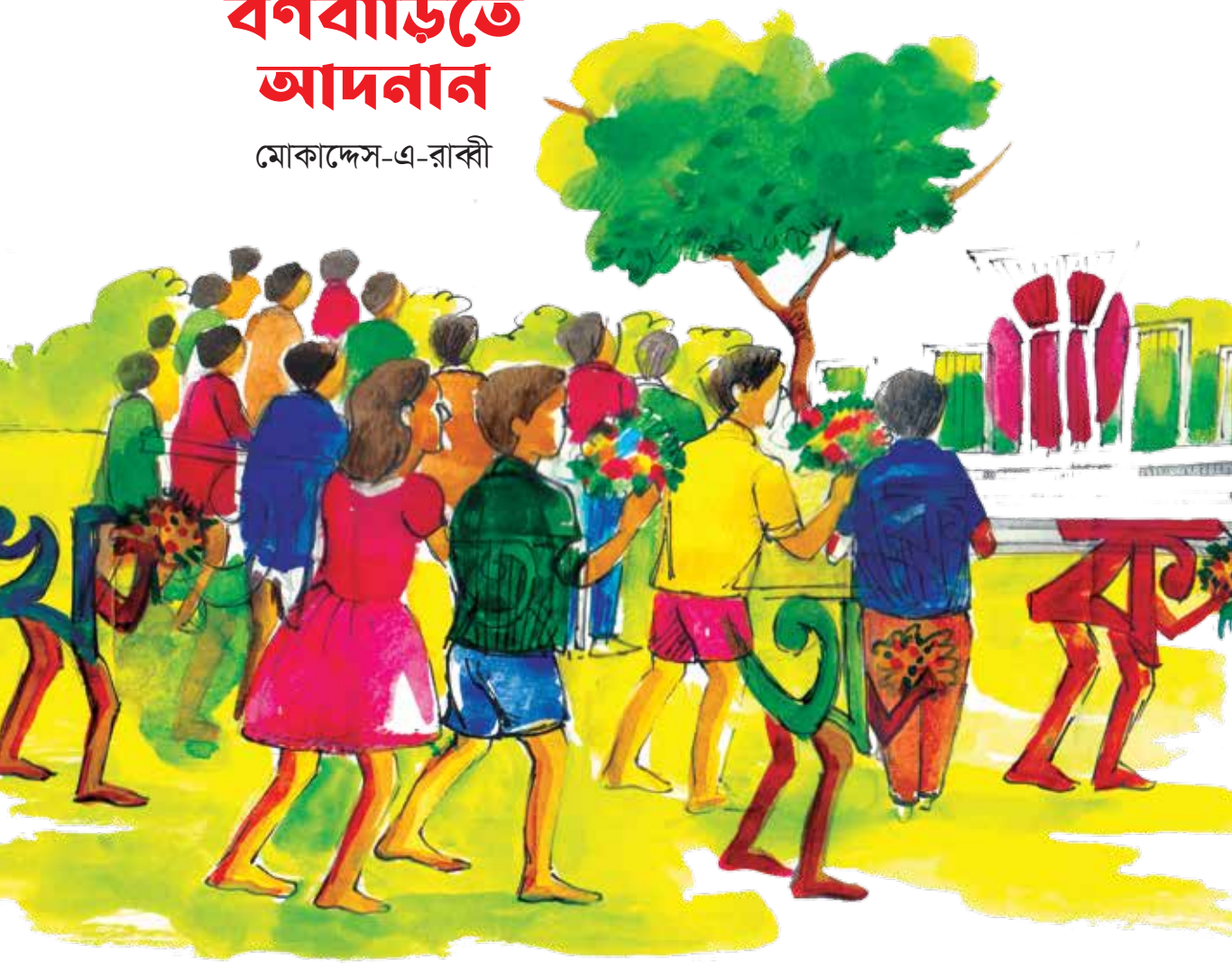

তখন খুব ভোর। পা টিপে টিপে বাসার বাইরে বেড়িয়ে ছুটতে থাকে আদনান। অনেক মসজিদে তখন ফজরের আজান হচ্ছিল। অন্ধকার ছিল তখনো। চুপি চুপি বের হতে হয়েছে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। উদ্দেশ হলো সবার আগে শহিদমিনারে ফুল দেওয়া। শহিদমিনারের সামনে এসে হাজির হতেই অবাক করার মতো কাণ্ড দেখল। দেখল ওরা দৌড়াদৌড়ি করছে। ওরা কারা? ভাবছ আদনান এর উদ্দেশ সফল হলো না, তাইতো। না সেরকম কিছু না। আদনান দেখল অ,আ,ক আর খ'রা খুব দৌড়াদৌড়ি করছে। শহিদমিনারে থাকা অ আর ক বর্ণ'রা যে হাঁটতেও পারে সেটা এত ভোরে না আসলে বুঝতও না। তাহলে কী ওরা কথা বলতে পারে? পরীক্ষা করতে চাইল আদনান। আদনান বলল, 'কী

খবর বর্ণমালা ভাইয়ারা, তোমরা দৌড়াদৌড়ি করছ কেন? নাকি নাচানাচি করছ? কোনটা?'

বর্ণমালা'রা কেউ কথা বলে না। বরং আদনানের কথা শুনে স্থির হয়ে যায়। কোনো বর্ণই আর নড়াচড়া করছে না।

খানিক পরে আদনান আবার জিজ্ঞেস করল,'ও বর্ণ ভাইয়েরা তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না?'

বর্ণমালা'রা জবাব দিল,

'শুনতে পারছি।' এ কথা বলেই আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। বসে থাকলে তো আর চলে না। আজকে ওদের বাড়িতে অতিথি দিয়ে ভরে যাবে। অতিথিরা থাকবেও সারাদিন। সবসময় কেউ না কেউ না আবার আসতেই থাকবে। ওদের বাড়িতে সব অতিথি ফুল নিয়ে আসবে। ফুলে ফুলে সাজবে পুরো বাড়ি। হলুদ, লাল, গোলাপি আরও কত রঙের ফুল ডিগবাজি দিবে। আহ কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। বর্ণমালা'রা দেখল আদনানকে। ভালো করে দেখল। আরোও দেখল আদনানের হাতে একটা লাল টসটসে গাঁদা ফুল। আদনানই ওদের প্রথম অতিথি। বর্ণমালারা বলল,'কে ভাই তুমি।'

আদনান বলল,'আমার নাম আদনান। আমি ক্লাস টু-এ পড়ি।'

বর্ণমালা'রা বলল, 'তুমি কী আমাদের জন্মদিনের উপহার হিসেবে ফুল নিয়ে এসেছ ?

আদনান বলল, 'তোমাদের জন্মদিন ?

'হুম।'

'আজকে?'

বর্ণমালারা সবাই সমস্বরে বলল,' কেন তুমি জানো না? তবে ফুল নিয়ে এসেছ কার জন্য।'

'ভাষা'র জন্য। আজকে ভাষা দিবস।'

'ও তাই! ভাষা কি দিয়ে তৈরি হয় জানো তো?'

আদনান থতমত খেয়ে হাঁ হয়ে চেয়ে রইল।

বর্ণমালা'রা বলল,'আমাদের দিয়ে। আমরা হলাম তোমাদের বইয়ের বর্ণমালা। আর এই শহিদমিনার হলো আমাদের বাড়ি। বর্ণবাড়ি।'

আদনান বলল,'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাষা দিবসে তোমাদের জন্মদিন হয় কী করে?

'বাংলা ভাষা'র জন্য এদেশের ভাষা সৈনিকরা প্রাণ দিয়েছিল। সেই ভাষা সৈনিকরা...'

আদনান ওদের কথা কেড়ে নিয়ে বলল,' হুম, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার।'

বর্ণমালারা বলল, 'এই তো ইতিহাস তুমি জানোই। পাকিস্তানিরা আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। আমাদেরকে মানে তোমাদের এই বাংলা বর্ণমালাদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু সালাম, রফিক ভাইয়েরা তাঁদের মূল্যবান জীবন দিয়ে রক্ষা করে গেছে আমাদের। আর সেই দিনটা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল।'

'হুম, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল।' মাথা দোলায় আদনান।

'ওই দিন আমাদের পুনঃজন্ম হয়েছিল। সেই জন্য এই দিনই আমদের জন্মদিন। আর আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। আমার জন্মদিন।'

আদনান একটু ব্যথিত হয়ে বলল,'দুঃখিত আমার বর্ণমালা বন্ধুরা। আমি তোমাদেরকে সবার আগে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে অন্ধকার থাকতেই ছুটে এসেছি। এই আমার অতি ক্ষুদ্র উপহার। শুভ জন্মদিন প্রিয় বর্ণমালা'রা।'

বর্ণমালা'রা বলল,'অনেক ধন্যবাদ আদনান। তুমি অনেক ভালো থাকো। ওই যে দেখো আমাদের অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। আমরা এখন জায়গা মতো চলে যাই।' বলেই বর্ণমালা'রা লাফাতে লাফাতে শহিদ মিনারের তিন ধরনের স্তম্ভে গিয়ে স্থির হয়ে বসে গেল। বসেই একদম চুপচাপ হয়ে গেল।

দিনের আলো বের হতে শুরু করেছে। আদনান দেখছে ওর ভাইয়া আপুরা সবাই আসতে শুরু করেছে বর্ণবাড়িতে। সবার হাতে হাতে ফুল। ■

শিশু সাহিত্যিক

**পড়শী চক্রবর্ত্তী**, সপ্তম শ্রেণি, হিরা মিয়া গার্লস হাই স্কুল, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

**রুসাব**, নার্সারি শ্রেণি, শহীদ বাবুল একাডেমি, ঢাকা

# এক যে ছিল কোকিল রাজ্য

এস আই সানী

সে এক সময়ের কথা। গ্রাম থেকে বেশ দূরে ছিল গভীর এক বন। বনটা ছিল নানান জাতের বড়ো বড়ো বৃক্ষ আর লতাপাতায় ছাওয়া। গাছগাছালির পরিমাণ ছিল অধিক। যেন ঠাসাঠাসি করে বেড়ে উঠেছে গাছেরা। দূর থেকে অন্ধকারের মতো লাগত বনটাকে।

সেই বনে বাস করত কিছু কাক আর কিছু কোকিল। কাক আর কোকিল আলাদা জাতের হলেও তারা ছিল একই রঙের। তাই মিলেমিশে তারা একসাথে থাকত। অবশ্য ফিঙে পাখির রংও

একই। তবে ফিঙেরা পাখিদের রাজা হওয়ায় তারা কাক-কোকিলদের সাথে মিশত না। তারা থাকত আরো দূরে, আরেক বনে।

কাক-কোকিলদের বনে একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল। আর তা হচ্ছে, সেখানে অন্য কোনো পাখি বাস করতে পারত না। বনটা আগে শকুনদের দখলে ছিল। শকুনেরা ছিল খুবই বাজে স্বভাবের। তারা শুধুশুধু ঝগড়াঝাঁটি করত সে বনে। বনের আশেপাশে অন্য কোনো পাখি ঘুরতে আসলে তারা তাদের ওপর হামলা করতো।

একদিন একটি কাকের ছানা আরেকটি কোকিলের ছানা উড়তে বেরিয়েছিল। নতুন উড়তে শিখেছিল তারা। তাই মনের আনন্দে উড়তে উড়তে সেই বনের পাশে চলে গিয়েছিল। তখন দুষ্টু শকুনেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠুকরে ঠুকরে তাদেরকে রক্তাক্ত করে। সে খবর কাক-কোকিলদের কানে পৌঁছালে তারা একজোট হয়ে উড়ে যায় বনের পাশে। চারিদিক থেকে ঘেরাও করে বন। তারপর শকুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধে শকুনদের তাড়িয়ে তারা বন দখল করে নেয়।

যুদ্ধে যাওয়ার সময় কাক-কোকিলেরা অন্যান্য পাখিদেরও তাদের সঙ্গী হওয়ার আহ্বান করে। কিন্তু কোনো পাখিই শকুনদের ভয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। আর এ জন্যই তারা তাদের বনে অন্য পাখিদের বাস করতে দিতো না। তবে তাদের বনে সবাই বেড়াতে আসতে পারত। সবাইকে সেই অধিকার দিয়েছিল তারা। অন্যান্য পাখিরা তাই দু-একদিনের অতিথি হয়ে এখানে বেড়াতে আসত।

কাক আর কোকিলদের বাসা ছিল বনের প্রতিটা গাছের শাখায় শাখায়। সুন্দর সুন্দর বাসা বুনত তারা। দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত পথিকের। কাকদের তুলনায় কোকিলদের বাসা ছিল বেশি। কেননা, কোকিলেরা সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু হলে কী হবে, বনের পরিচালনায় ছিল কাকেরাই। শক্তি-সামর্থ্যে, শরীর-স্বাস্থ্যে কাকেরা ছিল কোকিলদের চেয়ে অনেক উপরে। শিক্ষা-দীক্ষায়ও তারা এগিয়ে ছিল। তাছাড়া কাকদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ছিল প্রখর। অন্যদিকে কোকিলেরা ছিল আরাম ও শান্তিপ্রিয়, বন্ধুবৎসল। ঝগড়াঝাঁটি তাদের মোটেও পছন্দ ছিল না। তাই তারা কাকদের কর্তৃত্ব মেনে চলত।

বনে ছিল দুটি অংশ। একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে। পূর্বাংশ ছিল কোকিলদের রাজ্য, আর পশ্চিম বনে বাস করত কাকেরা। পূর্ব বনে নানাজাতের ফুল ফুটত। ফুলের সুরভিতে সদা ম-ম করত বাগান। দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে ভ্রমর আর রং-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে আসত। উড়ে উড়ে মনের আনন্দে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াতো তারা। ফুলের সাথে দোস্তি গড়ত, ভাব জমাতো। ফুলেরাও সুবাসে মোহিত করে রাখত সবসময়।

মৌমাছিরাও অনেক দূর থেকে পালা করে ঝাঁকবেধে আসত এই ফুলের বনে। পরম আদরে ফুলেরা তাদেরকেও স্বাগত জানাতো। ফুলে ফুলে উড়ে মধু নিয়ে মৌমাছিরা ফিরে যেত মৌচাকে।

শুধু কি তাই? বসন্তে দখিন হাওয়া আছড়ে পড়তো ফুলের বনে। তারপর সে হাওয়া ফুলের সৌরভ নিয়ে বয়ে যেত পাশের গাঁয়ে। ঘ্রাণে ভরিয়ে দিত গাঁয়ের পরিবেশ। ফুলের গন্ধে বিভোর হতো গাঁয়ের মানুষ। পথিকেরা বনের পাশে এসে থমকে দাঁড়াতো। মনোহরি ফুলের বিচিত্র সুবাসে প্রাণ জুড়াতো। ঠিক তখনই কোকিলেরা তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে ভরিয়ে তুলত চারপাশ। অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ত মোহনীয় সে সুর। তাদের সেই কুহুকুহু গানে মন ভরাতো গাঁয়ের মানুষজন।

বিচিত্র ফুলের মিষ্টি সৌরভ, নানারুপের প্রজাপতির ওড়াউড়ি, ঝাঁক বাধা মৌমাছি আর ভ্রমরার গুঞ্জরণ, মধুকণ্ঠি কোকিলের কুহুকুহু কলতান– সব মিলিয়ে পূর্ববন ছিল ঠিক যেন এক স্বর্গরাজ্য।

অন্যদিকে পশ্চিম বন ছিল সে তুলনায় অনেকটাই সৌন্দর্যহীন, মলিন। সেখানে তেমন কোনো ফুল ফুটত না। উড়ে উড়ে প্রজাপতিরাও নৃত্য করত না। আর মৌমাছিদের আনাগোনাও ছিল হাতেগোনা। এজন্য কাকদের মনে ছিল বেজায় দুঃখ। তবে তারা ছিল বড্ড ধূর্ত। মনে মনে তারা কোকিলদের সহ্য

করতে পারত না। কিন্তু বাইরে তারা এগুলো প্রকাশ করত না।

কিছুদিন পরে কাকেরা একটা বুদ্ধি বের করল। আর সে বুদ্ধিমাফিক প্রতিদিন তারা পূর্ব বন থেকে ফুল আর মধু নিয়ে আসত। এতে কোকিলেরা কোনো আপত্তি করত না। কেননা, কাকদের এমন কাজে পূর্ব বনের ফুল-মধু একটুও কমত না। বরং আরো বেশি হারে ফুলেরা ফুটে উঠত। আরো বেশি করে মধু তৈরি করত। এর সব কৃতিত্ব ছিল কোকিলদের সুমধুর কণ্ঠের কুহুতান। কাকেরা যখন পূর্ব বনের ফুল-মধু লুটে নিত, তখন কোকিলেরা মিষ্টি সুরে গান গাইতো। সে গানের সুরে পরম আনন্দে ফুল ফুটত। সুবাসে ভরে যেত বনের পরিবেশ। আর তখন দলে দলে ছুটে আসত প্রজাপতি, মৌমাছি আর ভোমরা।

একসময় এ রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয় কাকেরা। ফলে মনে মনে তারা বড্ড খুশি। তাদের রাজ্যও এবার ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। ভ্রমর আসবে। অলিরা গাইবে। প্রজাপতি নাচবে।

স্বপ্নে বিভোর কাকদের চোখে ঘুম নামে না খুশিতে।

খুশি খুশি মনে একদিন তারা সভা ডাকল। নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত কাক সভাস্থলে এসে পৌঁছালো। তখন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো- তারাও এখন থেকে কোকিলদের মতো কুহুকুহু ডেকে বেড়াবে। তাদের মতো গান গাইবে। গান গেয়ে ফুল ফোটাবে। প্রজাপতি-মৌমাছি আনবে। সমৃদ্ধ করবে তাদের পশ্চিম বন।

যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। কোকিলের মতো কাকেরাও গান গাওয়া শুরু করল। গান গাইতে গাইতে সারা বন ঘুরতে থাকল। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। তাদের কর্কশ 'কা-কা' ডাকে পশ্চিম বনে যে ফুলগুলো ছিল, তার সবই ঝরে গেল। যে কটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াতো, ভয় পেয়ে তারাও পালিয়ে গেল। যে মৌমাছিগুলো তাদের বাগানজুড়ে গুনগুন করে গান গাইত, ভীত হয়ে তারাও উধাও হয়ে গেল। আর এদিকে পথিকেরাও তাদের কর্কশ স্বরে মহাবিরক্ত হয়ে তাদেরকে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারতে লাগল। বোকা কাকদের এমন বোকামি দেখে কোকিলেরা তখন মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ফুল, প্রজাপতি আর মৌমাছিদের হারিয়ে, সেইসাথে পথিকদের ছোঁড়া ইট-পাটকেলে আহত হয়ে কাকেরা ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে। তার উপর আবার কোকিলদের এমন উপহাসের হাসি। কাটা ঘায়ে এ যেন নুনের ছিটা। তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে কোকিলদের ওপর। ভীষণ খ্যাপে যায় তারা। মনে মনে ভাবে, তারা এর উত্তম প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। এমনটা ভেবে মনটাতে সান্ত্বনার পরশ বুলিয়ে স্ব-স্ব বাসায় চলে যায় তারা।

এভাবে কেটে যায় দিন কয়েক। আহত কাকেরা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়। কিন্তু তাদের মনের অসুখ সারে না। অপমান বোধের ক্ষত রয়ে যায় মনে।

এর কদিন পর কাকেরা জরুরি সভা ডাকে তাদের রাজ্যে। কী উপায়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে।

সভায় উপস্থিত সকল কাক এক এক করে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু কারোটা মনঃপুত হয় না। সবশেষে শক্ত-সামর্থ্য এক যুবক কাক উঠে দাঁড়ায়। সে বলে, তারা পূর্ব বনের সকল ফুল ঝরিয়ে দেবে। প্রজাপতি আর মৌপোকাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। সবুজ লতাপাতা সব বিনষ্ট করে দিয়ে পূর্ব বনের সৌন্দর্য ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে।

যুবক কাকটির এমন পরামর্শে সবাই বাহবা দিয়ে ওঠে। ডানা ঝাপটে তাকে সাধুবাদ জানায়। সকলের সমর্থন পেয়ে যুবক কাকটি খুশিতে কয়েকবার 'কা-কা' করে ডিগবাজি খায় গাছের মোটা ডালের ওপর। কিন্তু সবাইকে থামিয়ে দিয়ে ওপাশ থেকে একটা বৃদ্ধ কাক টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। খুক-খুক করে বারকয়েক কেশে শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু কোকিলের কণ্ঠ রোধ করবে কে? তারা তো গান গেয়ে আবারো ফুল ফোটাবে। ভ্রমর আনবে। প্রজাপতি আনবে। পুনরায় ভরে উঠবে তাদের রাজ্য।'

বৃদ্ধ কাকের এমন যুক্তিতে সভা জুড়ে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। তাই তো! বৃদ্ধ কাকের কথা তো ঠিক!

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ বৃদ্ধ কাকের দিকে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। কেউ কথা বলে না। সবাই চিন্তিত। শেষে সভাপ্রধান দাঁড়কাক সেদিনের মতো সভা মুলতুবি ঘোষণা করে। আর এ বিষয়ে সবাইকে বেশি বেশি ভাবনা-চিন্তা করে একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করতে বলে।

দু-দিন কেটে যায়। পরদিন আবারো সভা বসে কাকদের। একএক করে সবাই হাজির হয় সভাস্থলে। সভাপ্রধান দাঁড়কাক দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে সবাইকে দেখে নেয়। তারপর কে কী উপায় খুঁজে পেয়েছে তা পেশ করতে আহ্বান করে। দাঁড়কাকের আহ্বানে ধূসর রঙের মাঝবয়সি একটি কাক উঠে দাঁড়ায়। তারপর পায়ের আঙুল দিয়ে একবার মাথা চুলকে বলে ওঠে, 'মহামান্য! আমার কাছে একটি উত্তম প্রস্তাব আছে। যদি অভয় দেন, তাহলে আমি তা সবার সামনে পেশ করতে আগ্রহী।'

দাঁড়কাক অভয় দিলে সে বলতে শুরু করে, 'মহামান্য! যেহেতু আমরাই এ বনের অধিপতি, আমরাই পরিচালনা করি এ বনকে, সেহেতু আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারি। আমরা চাইলেই যখন-তখন যে-কোনো নিয়মনীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারি। আমরা চাইলে নতুন নিয়ম সৃষ্টিও করতে পারি।'

এ পর্যন্ত বলে একটু থামে ধূসরকাক। অন্যান্য কাকেরা একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। তারা ঠাহর করতে পারে না ধূসরকাক কী বলতে চাচ্ছে। শেষমেশ আগ্রহ নিয়ে ধূসর কাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

ধূসর কাক পুনরায় বলতে শুরু করে, 'মহামান্য! এই মুহূর্তে আমার মাথায় যে বুদ্ধিটা লাফালাফি করছে, তা হচ্ছে- একটি নতুন নিয়ম জারি করা। আর সেই নিয়মটি হচ্ছে, এ বনের ভাষা হবে একটিই। আর তা হলো- আমাদের ভাষা কা-কা। কোকিলেরা এখন থেকে আর তাদের ভাষায় কথা বলতে পারবে না। তাদের কথা বলতে হবে আমাদের ভাষায় কা-কা করে। তাহলে অল্পদিনেই তাদের পতন হবে। তাদের রাজ্যের সৌন্দর্য বিলীন হবে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধূসর কাকের শেষোক্ত কথাগুলো শোনে উপস্থিত কাকেরা। সবাই বিস্মিত হয় অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য শুনে। সে থেমে যেতেই বিস্ময় সামলে সকলে সমানতালে ডানা ঝাপটে তাকে অভিনন্দিত করে। সভাপ্রধান দাঁড়কাক আনন্দে আত্মহারা হয়। ডানা ঝাপটে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে কয়েকবার। তারপর ঘোষণা করে, 'ভবিষ্যতে ধূসর কাককেই এ বনের প্রধান করা হবে।'

দাঁড়কাকের এ ঘোষণায় খুশিতে ডালের ওপর বারকয়েক ডিগবাজি খায় ধূসর কাক। অবশেষে সকল কাকের প্রাণে প্রশান্তি আসে। তারা কোকিলদের ছোটো করার একটি উপায় পেয়েছে।

পরদিন বন জুড়ে ঘোষণা করা হয়, এ বনের ভাষা হবে একটিই, এবং তা হচ্ছে, কা-কা বনে বসবাসকারী সকলকে কা-কা ভাষায় কথা বলতে

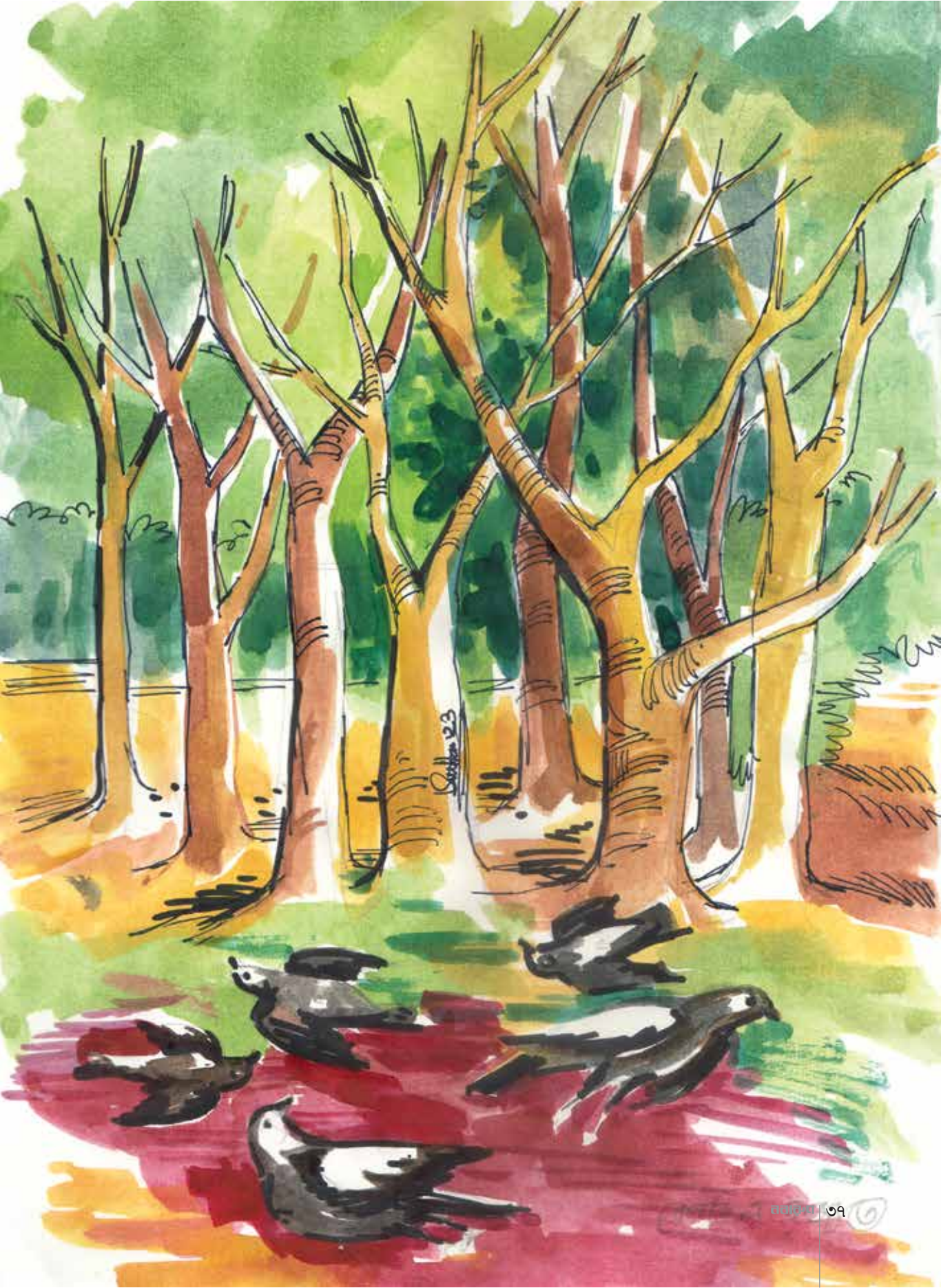

হবে। এর বাইরে অন্য কোনো ভাষা এ বনে চলবে না, চলতে দেওয়া হবে না।

দাঁড়কাক পূর্ব বনে উপস্থিত হয়ে কোকিলদের মাঝে ঘোষণা করে, 'কা-কা, একমাত্র কা-কা'ই হবে এ বনের রাজ্যভাষা।'

দাঁড়কাকের এমন নীতিহীন সিদ্ধান্তে কোকিলেরা তৎক্ষণাৎ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ জানায়। তাদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার অধিকার কাকদের নেই। ক্ষোভ আর প্রতিবাদের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে পুরো কোকিল সমাজে। তারা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তারা এর প্রতিবাদে পথে নামার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন বনজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। বনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কাক সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়, যাতে কোকিলেরা কোনো ধরনের প্রতিবাদ-সমাবেশ করতে না পারে। কিন্তু রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা কোকিলেরা তাদের মুখের ভাষা ফিরে পাওয়ার দাবিতে জরুরি অবস্থা ভেঙে প্রতিবাদ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা রং-বেরঙের ফুলের রেণু দিয়ে বুকে, পিঠে, ডানায় লিখে নেয় বিভিন্ন স্লোগান। 'রাজ্যভাষা কুহু চাই', 'মায়ের ভাষা ফেরত চাই', 'কোকিলের ভাষা কুহুকুহু', 'কাকের ভাষা মানি না' –এমন নানান স্লোগানে তারা তাদের বুক-পিঠ সাজিয়ে মিছিল নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কপাল তাদের বড্ড খারাপ। তাদের মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ কাকেরা। হামলা চালায়। তাদের হামলায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাঁচ-পাঁচটি তাজা কোকিল। রক্তে ভেসে যায় বনের নরম মাটি। নিহত হয় বেড়াতে আসা আরো একটি নিরীহ বাচ্চা পাখি। আহত হয় আরো অনেকে।

নিষ্ঠুর কাকেরা তবুও ক্ষান্ত হয় না তারা ছত্রভঙ্গ মিছিল থেকে ধরে নিয়ে যায় কয়েকটি কোকিলকে। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। পূর্ব বনের সমস্ত কোকিল বেরিয়ে আসে একযোগে। তাদের চোখে যেন আগুন। দৃষ্টিতে যেন গোলাবারুদ। শান্তিপ্রিয় কোকিলেরা হয়ে ওঠে হিংস্র বাঘ।

সমস্ত কোকিলের একজোট এবং এমন হিংস্রতা মনোভাব দেখে কাকেরা ভয়ে পূর্ব বন ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদের পশ্চিম বনে। কিন্তু থেমে থাকে না পূর্ব বনের কোকিলেরা। তারা তাদের নিরপরাধ ভাইদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিচার আর গ্রেফতারকৃত কোকিলদের মুক্তি এবং মাতৃভাষা ফিরে পাওয়ার দাবিতে মুহুর্মুহু মিছিল করে। একটানা কুহুকুহু স্বরে কাঁপিয়ে তোলে পুরো বন। ঘেরাও করে কাকরাজ্য। তাদের সাথে যোগ দেয় বনের সমস্ত প্রজাপতি, ভ্রমর আর মৌমাছি। অন্য জাতের পাখিরাও আসে দলে দলে। সব মিলে চরম ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয় পুরো বনে। এই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায় কাকেরা। তাদের মনোবল ভেঙে যায়। ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তারা। নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার আশঙ্কাও জাগে মনে। শেষে কোকিলদের দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

পরদিন কাকেরা বন্দি কোকিলদের মুক্তি দেয়। নিহত কোকিলদের হত্যার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেয়। আর সেইসাথে 'কুহু'কে পূর্ব বনের মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আরো ঘোষণা করে যে, আজীবন কোকিলেরা তাদের কুহুকুহু ভাষায় গান করুক, কথা বলুক, যা ইচ্ছে তাই করুক। তাতে কাকেরা আর কখনোই বাধা দেবে না।

কাকদের এমন ঘোষণায় নিমিষেই বিজয়ের পুলক বয়ে যায় কোকিলদের মনে। বিজয়ের আনন্দে মধুর কলতানে মুখর করে তোলে চারিপাশ। মাতৃভাষায় ডাকতে পারার স্বাধীনতা পেয়ে একটানা কুহুকুহু কলতানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। তারপর ডানা ঝাপটে তারা ফিরে চলে তাদের কোকিলরাজ্যে, তাদের আপন ঠিকানায়। ■

---

গল্পকার ও সাংবাদিক

# দেওয়াল বিজ্ঞাপন

আশরাফ আলী চারু

ঐশীর বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে একা একাই বিলাপ করছেন। ঐশীর মা মেয়েকে পাশের রুমে পড়াচ্ছিলেন। ওনার ফেরার বিষয়টি মা মেয়ে দুজনেই বুঝতে পারলেন। পাশের রুম থেকে এসে ঐশীর মা জিজ্ঞেস করলেন কার সাথে কথা বলছো? এই রুমে তো কেউ নেই। দিনদিন পাগল হয়ে যাচ্ছ মনে হয়!

ঠিকই বলেছো, পাগল হওয়া ছাড়া উপায় আছে বলো? অফিসে শুনলাম সরকার গেজেট প্রকাশ করেছে। অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব জায়গাতেই বাধ্যতামূলক উর্দু চালু করবে। আচ্ছা বলতো, যদি ওই অচেনা ভাষাটা চালু করা হয় ঐশীর কী অবস্থা হবে? সপ্তম শ্রেণি থেকে কি আবার প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করাবো মেয়েকে? আজব ব্যাপার! চাকরিটাও মনে হয় থাকবে না। উর্দু বলতে পারি না। ওটা না বলতে পারলে কী চাকরিতে রাখবে? বাঙালিদের পথে বসানোর একটা পায়তারা এটা আর কিছুই না। ওরা বাঙালিদের দেখতেই পারে না!

সারা পাকিস্তান মিলে কয় শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলে? জানতে চাইলো ঐশীর মা।

জওয়াবে ঐশীর বাবা জানালেন সারা পাকিস্তানে বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। উর্দুতে গড়ে পাঁচ ছয় শতাংশ লোক কথা বলে হয়ত। সরকারের মাথায় ভূত চেপেছে। কীভাবে বাঙালিদের দমিয়ে রাখা যায় এই চেষ্টা করছে তারা।

ঐশীর দিকে তাকিয়ে আফসার সাহেবের চোখের কোণে পানি জমে উঠে। মেয়েটার পড়ালেখার কী হবে? যদি গেজেট বাস্তবায়ন হয় তবে গতি কী?

আফসার সাহেবের মনের গতি বুঝতে পারেন ঐশীর মা। লোকটার মাঝে ভীষণ ভাষা প্রীতি খেয়াল করেন তিনি। দেশ ভাগের আগে প্রতিদিন ব্রিটিশদের জুলুম নিপীড়নের বিষয়াদি নিয়ে এভাবেই বিলাপ বকতেন। দেশ ভাগের পর কয়টা দিন ভালো গেল! কত কিছুর পর দেশ ভাগ হলো অথচ শান্তি কই? স্বাধীন হতে না হতেই আরেকদল লোক ভাষা কেড়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে।

রাতে ঐশীর ঘুম হয়নি। বাবার মাতৃভাষা নিয়ে আহাজারি বার বার তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভাষা হলো মনের অলংকার। ভাষা হলো একটা জাতির অহংকার। এই ভাষাই যদি বাঙালিদের মুখ থেকে কেঁড়ে নেওয়া হয় তবে বাঙালিত্ব বলে রইল কী? ইতোমধ্যে তার কচি মনে বিষয়টি বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? একটা কিছু তো করতে হবে তাই সে মনে মনে এক বুদ্ধি আটলো। খাতার পাতায় পাতায় স্লোগান লিখলো। মাতৃভাষার মর্যাদা পাওয়ার স্লোগান–

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,
বাংলা বলেই শান্তি পাই।

তোমার ভাষা আমার ভাষা
শান্তি সুখের বাংলা ভাষা।

রাষ্ট্রভাষা উর্দু নয়
বাংলা চাই বাংলা চাই।

শুক্রবার ছিল বলে সারাদিন রুমে বসে বসে বড়ো বড়ো অক্ষরে এসব স্লোগান লিখলো ঐশী। মায়ের চোখ এড়ায়নি এসব। মা তার মেয়ের ভাষা প্রীতি দেখে আপ্লুতও হয়েছেন কয়েক বার। এই বয়সেই মেয়ের এমন প্রতিবাদও সত্যিই মুগ্ধ করেছে তাকে।

সাংসারিক ব্যস্ততায় আফসার সাহেব সারাদিন বাইরে ছিলেন। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতেই ঐশী বাবাকে বললো- বাবা, ময়দা পাওয়া যাবে দোকানে?

পাওয়া যাবে তো মা, রুটি খাওয়ার মন চাইছে মা? কোনো চিন্তা নেই আমি এখনই আনছি মা, বলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সময় রাত বারোটার পেরিয়ে গেছে। ঐশী ঘুমোয়নি। সে আলাদা রুমে থাকে। তাই সুবিধা মতো এই সময়ে সে রান্না ঘরে ঢুকলো। সন্ধ্যায় বাবা যে ময়দা এনেছিল তার সবটা শেষ হয়নি। সেই ময়দা থেকে কিছু ময়দা নিয়ে সে পানি দিয়ে লেই তৈরি করলো। ঠান্ডা হলে সেই লেই আর দিনে লেখা স্লোগান সম্বলিত পাতাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মা বাবা কিছু বুঝে উঠার আগেই সব পাতা দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে এসে শুইয়ে পড়লো।

সকাল বেলায় মহল্লায় একটা চাপা গুঞ্জন আরম্ভ হলো। বলাবলি শুরু হলো ভাষার জন্য তবে জেগে উঠেছে সবাই! এটা আপামর জনতারই চাওয়া। দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন। মহল্লার মানুষের মনে সাড়া পড়ে গেল। তারা বিভিন্ন দলে উপদলে ভাষা সংগ্রামের নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলো। বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণরা ভাষা সংগ্রাম পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলো।

সরকারের নজরও এড়ায়নি বিষয়টি। তবে দেওয়াল বিজ্ঞাপনটি কে করেছে সরকারের প্রশাসন বহু চেষ্টা করেও কাউকে খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি মহল্লার লোকেরাও। তবে এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী দেওয়াল বিজ্ঞাপনের কথা ঐশীর মা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির নির্মম ঘটনার পর আফসার সাহেব বুঝেছিলেন এই দেওয়াল বিজ্ঞাপনের জন্যই মেয়ে ময়দা কিনিয়েছিল সেদিন। ■

গল্পকার

গল্প

# একুশের দিনে

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশের প্রথম প্রহরে শহিদমিনারে ফুল দিতে হবে। তাই আজ তাড়াতাড়ি ঘুম হতে জেগে উঠলাম। ফজর নামাজ আদায় করে তৈরি হলাম শহিদমিনারে যাবার জন্য। আমরা কয়েকজন বন্ধু আগেই ফুলের মালা তৈরি করে রেখেছিলাম।

আমি ঘর হোক বের হয়ে অনিকদের বাড়িতে যাই। ওদের বাড়িতেই ফুলের মালাটি রাখা হয়েছিল। আমি গিয়ে দেখি আমার অন্যান্য বন্ধুরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

তারপর আমরা বন্ধুরা একত্রে মিলে ফুলের মালাটি নিয়ে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' গানটি গাইতে গাইতে শহিদমিনারের দিকে রওনা হই।

শহিদমিনারের সামনে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। মানুষের ভীড়ে কাছে আগানোই যায় না। তখন বন্ধুরা আমাকে দোষারোপ করল যে, তোর জন্যই আসতে দেরি হয়েছে। আগে এলে এত ভীড় থাকত না।

আমি তখন বললাম, না-ভাই রাত বারোটা এক মিনিট হতেই এখানে ভীড় জমে আছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম, ভীড় অনেকটা কমে গেছে। তখন আমরা বন্ধুরা মিলে ফুলের মালাটি শহিদমিনারে অর্পণ করলাম। মালা অর্পণ শেষে আমার বন্ধুরা স্কুলের দিকে যেতে চাইল। সেখানে আজ সকালে অনুষ্ঠান হবে।

আমি যখন থেকে ফুলের মালাটি নিয়ে শহিদমিনারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু সামনে এগুতে পারছি না। তখন থেকেই লক্ষ করেছি, একটি ছেলে, পরনে ছেঁড়া শার্ট আর লুঙ্গি; একটি ফুলের তোড়া নিয়ে

শহিদমিনারের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকের ভীড়ে সামনে এগুতে সাহস পাচ্ছে না। আমার খুব ইচ্ছে হলো সেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার। তাই বন্ধুদের বললাম, তোরা স্কুলে চলে যা। আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি।

তখন ওরা স্কুলে চলে গেল।

আমি সেই ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোর হাতে ফুল কেন?

ভাইজান শহিদমিনারে দেওনের লাইগ্যা আনছি।

দিচ্ছ না কেন?

ডরে দেই না। যদি কেউ কিছু কয়। আপনে আমার ফুলের তোড়াডা ঐখানে দিয়া দিবেন?

আমার দিতে হবে না। তোমার ফুল তুমিই-ই দিয়ে যাও। কেউ কিছু বলবে না।

আমার কথাতে ছেলেটি একটু সাহস পেল। সে সিঁড়ি বেয়ে শহিদমিনারে উঠল! আমি তখন বললাম, এবার তোমার ফুলের তোড়াটা রাখ।

আমি বলার পর ছেলেটি তার ফুলের তোড়াটি শহিদমিনারে অর্পন করলো।

তারপর আমরা দুজনে শহিদ মিনারের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

আমার বেশ আগ্রহ হলো ছেলেটির প্রতি। ভাবলাম, একটি গরিব ছেলে। তারও মন আছে শহিদমিনারে ফুল দেবার।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

হোসেন মিয়া।

কী করো?

রিকশা চালাই। মালিকেরে প্রতিদিন যা টাকা পাই তার অর্ধেক দেই; বাকি টাকা আমি রাখি।

তোমার বাবা-মা নেই?

মা আছে, বাবা নাই। বাবা ছোটোকালে মইরা গেছে।

শহিদমিনারে ফুল দেয়ায় আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এখানে ফুল দিতে কে বলেছে?

ও তখন বলল, গতকাল আমার রিকশায় বইয়া এক লোক কইছে, 'আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস'।

আমি হেরে জিগাই, এই দিনে কি হইছে?

হেয় কইল, এই দিনে পাকিস্তানিরা আমগো দেশের অনেক ছাত্র মাইরা ফালাইছে। তারা কইছে আমগো ভাষা উর্দু হইতে হইব। বাংলা ভাষায় কথা কওন যাইব না।

হেইর লাইগ্যাই নাকি এই শহিদমিনার বানাইছে। আমরাতো অহন জিততা গেছি। তাই আমার অনেক ইচ্ছা হইল, শহিদমিনারে আমি একটু ফুল দিমু।

তুমি ফুল কোথায় পেলে?

আমার রিকশার মালিকের বাসায় ফুলের বাগান আছে। সেইখান থাইক্যা আমি কালকা মালিকেরে না দেখাইয়া তিনডা গোলাপ ফুল আর ছয়ডা গেন্ধা ফুল ছিড়া আনছি। হেরপর একটা পাতাবাহারের ডালা ভাইঙা ফুলের তোড়াডা নিজের হাতে বানাইছি।

আমি ছেলেটির এত উৎসাহ দেখে খুব-ই বিস্মিত হলাম! ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম আর বললাম, তুমি প্রতিবছরই একুশে ফেব্রুয়ারির দিন এখানে এসে ফুল দিয়ে যাবা। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আমার কথাতে ও খুবই খুশি হলো এবং হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমিও তখন স্কুলে যেতে রওনা হলাম। পথিমধ্যে মনে মনে ভাবলাম, আমাদের দেশে এখনো এমন কিছু লোক আছে, যারা ধনী-বিত্তবান । কিন্তু তারা এখনো পাকিস্তানের পক্ষপাতি। তারা একুশে ফেব্রুয়ারি মানে না, মানতে চায় না। আবার এমন কিছু ছেলে আছে। যারা বিদেশি ভাষা নিয়ে ব্যস্ত। তারা ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ভাষা শিখতে চায়। ঐসব ভাষায় কথা বলতে চায়, গান গাইতে চায়। নিজের দেশের একতারা, দোতারার চেয়ে ঐসব দেশের ব্যান্ড-বাদ্যযন্ত্রকে তারা মূল্যায়ন দেয় বেশি। ঐসব ভাষাকে তারা প্রাধান্য দেয়। তারা বাংলা ভাষার মর্যাদা দিতে চায় না। অথচ তারা ধনীর দুলাল।

আর একটি পথের ছেলে, রিকশাচালক। তারও মন কত বড়ো! সে বাংলা ভাষার মর্যাদা বুঝে একুশের শহিদদের স্বরণে শহিদমিনারে ফুল দিতে আসে। একুশের শহিদদের ফুল দিয়ে বরণ করতে চায়।

আমার মতে সে-ইতো খাঁটি বাঙালি। তারই তো এদেশে বসবাস করার অধিকার বেশি! ■

---

গল্পকার

# ৭১ এবং মা

শহীদুল্লাহ শোভন

পৃথিবীতে অনেক ভাষা
আছে সবাই জানি।
মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা
সবার প্রিয় মানি।

অনুভূতির ভাষা মোদের
বাংলা প্রথম বুলি।
বাংলায় পড়ি বাংলায় লিখি
বাংলার গানে দুলি।
সকল ভাষার মিষ্টি ভাষা
বাংলা নাহি ভুলি।
শিরদাঁড়াকে উঁচু রেখে
বাংলাতে সুর তুলি।

স্বর-ব্যঞ্জন মধুর গাঁথুনি
লোলিত সুরের তান।
বর্ণ ধ্বনির ঐকতানে
গড়ে তোলে নিস্বান।
শব্দধারার দোল দুলনে
দোলে যে হৃদয়খান।
শ্রুতিমধুর সুর লহরী
বাংলা ভাষারই প্রাণ।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
বাংলায় বলে কথা।
ভাষার এমন ইতিবৃত্ত
নাহি যথাতথা।
অবুঝ মনের মানুষগুলো
করে যে শঠতা।
হাজার বছরের ঐতিহ্য
ঝাড়ে সব হীনতা।

ভাষার তরে কত ভাই যে
জীবন করেছে দান।
মরণপণে রাখবো তাদের
শোণিত ঝরার মান।
বিশ্ব জুড়ে রক্তে আঁকা
উড়ছে বাংলার নিশান।
লক্ষ কোটি ভাই-বোনেরা
তাকে সালাম জানান।

নব নব যুগের সনে
সাজবে নতুন সাজে।
বাংলা ভাষার বিজয়গাথা
থাকবে ধরার তাজে।
ভুলবো না যে মায়ের ভাষা
রাখবো হৃদয় মাঝে।
শপথ করি রইবে যে মান
মোদের সকল কাজে।

পৃথিবীতে অনেক ভাষা
আছে সবাই জানি।
মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা
সবার প্রিয় মানি।

# একুশের বীরসেনা

মো. মিহির হোসেন

একুশ আমায় দিয়েছে
মাতৃভাষায় কথা বলতে
একুশ থেকে পেয়েছি
প্রেরণা নিয়ে চলতে।

যাদের রক্তের বিনিময়ে
পেয়েছি এই ভাষা
এই দিনে রইল তাদের প্রতি
অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

# রানুর খালি হাত

সারমিন ইসলাম রত্না

টুপ টাপ টুপ শিশির পড়ছে। পাখি ডাকা, আবির রাঙা ভোর। দশ বছরের ছোট্ট শিশু রানু। ফুলের ঝুড়ি নিয়ে বের হলো। প্রভাতফেরির মিছিলে যোগ দিলো। মিছিলটি ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। রানু খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শহিদমিনারে পৌঁছাল।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে প্রিয় শহিদমিনার। শহিদমিনারের মাঝখানে টকটকে লাল সূর্য হাত বাড়িয়ে ডাকল। আকুল কণ্ঠে বলল, বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি- আমাদের মাতৃভাষা, পাকিস্তানি হায়েনারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে আমরা আমাদের ভাষাকে মুক্ত করেছি। আগলে রেখো আমাদের আগামী প্রজন্ম। রানুর চোখের পাতায় ভেসে উঠল জীর্ণশীর্ণ একটি ঘর। অসুস্থ বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না। কাজে যেতে পারছেন না। ভেসে উঠল দুখিনী মা ও ছোটোবোন রিতুর মুখ। রিতু কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, আফা কখন আইবো? খুব খিদা লাগছে। রানুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। শহিদ বেদিতে ফুল রেখে বলল, সালাম সালাম হাজার সালাম। শত শহিদের স্মরণে। রানুর খালি হাত। বাবা-মা দুখি দুখি মুখ করে বললেন, মা, আইজ কিছু নিয়া আসিস নাই? রানু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, আইজ একটাও ফুল বিক্রি করি নাই। সব ফুল শহিদমিনারে রাইখা আসছি। আমি জানি আইজ আমাগো না খাইয়া থাকতে হইবো। কিন্তু কী করুম? খুব ইচ্ছা করছিল। তোমরা মন খারাপ কইর না। বাবার চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা রানুকে বুকে টেনে নিলেন। গর্ব করে বললেন, রানু, আমরা একটুও মন খারাপ করি নাই। বরং খুশি হইছি। দেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি তোর ভালোবাসা দেইখা। রিতু রানুকে জড়িয়ে ধরল। রানু অপরূপ হাসি দিলো। সেই হাসিতে ছেয়ে গেল সমগ্র ঘর। ■

গল্পকার

# বাংলা ভাষার কদর

মো. জামাল উদ্দিন

বাংলা। বাঙালির প্রাণের ভাষা। এটি বিশ্বের একমাত্র ভাষা যা অর্জন করতে হয়েছে তাজা প্রাণের বিনিময়ে। বাংলা ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি ঢেলেছে তাজা প্রাণ। বিশাল আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলা ভাষা। মায়ের ভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আত্মত্যাগের এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে পুরো বিশ্ব।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর বাঙালির চেতনার প্রতীক বাংলা ভাষা বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি অর্জন করে। ইউনেস্কোর সেই স্বীকৃতির পর থেকে পৃথিবীর নানান ভাষাভাষী মানুষ দিনটি পালন করছে। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে এই দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে গোটা বিশ্ব। যা বাঙালির জন্য অন্যতম একটি গর্বের বিষয়।

বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা বলা হয়। এই ভাষার উৎপত্তি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকে। ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, এই ভাষার উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর আগে। বাংলা ভাষা হলো ইন্দো-আর্য ভাষা। এই ভাষাটি ব্যবহার করে থাকে প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতি। চর্যাপদ এই ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হলো বাংলা লিপি।

বাংলা ভাষা বিশ্বের পঞ্চম বহুল ব্যবহৃত ভাষা। এটি বাংলাদেশের মাতৃভাষা হলেও বিশ্বমণ্ডলে এমন দেশ পাওয়া কঠিন যেখানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় না। বিশ্বজুড়ে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। যার মধ্যে ২৬ কোটিরও বেশি বাংলা ভাষাভাষি মানুষ বাংলাদেশ ও ভারতে বসবাস করে। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বাকি ৪ কোটিরও বেশি মানুষ ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

ভারতে স্বীকৃত যে ২৩টি 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' রয়েছে, বাংলা তার অন্যতম। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার বিবেচনায় এটি দ্বিতীয়, হিন্দির পরই এর স্থান। ভারতে রাজ্যগুলো প্রয়োজনে হিন্দির পাশাপাশি নিজস্ব এক বা একাধিক দাফতরিক ভাষা গ্রহণ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বাংলাকে সেই মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া বাংলা আসাম এবং আন্দামান-নিকোবর রাজ্যের সহ-দাফতরিক ভাষা। দেশ বিভাগের কারণে পূর্ব বাংলা ছেড়ে যাওয়া

জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ 'পুনর্বাসিত' হয়েছিল বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্য এলাকায়। বিপুল বাঙালি-অধ্যুষিত এই রাজ্য ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাকে দ্বিতীয় দাফতরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এ ছাড়া উড়িষ্যা রাজ্যেও রয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। সে কারণে সেখানকার সরকারি প্রচার-প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডে হিন্দি ও উড়িয়্যার পাশাপাশি বাংলা ব্যাপক প্রচলিত।

বাংলা তৃতীয় যে দেশের 'রাষ্ট্রীয় ভাষা' হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে, সেই সিয়েরালিয়নের সঙ্গে এ ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশস্থলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কোনো যোগাযোগ নেই। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের অংশ হিসেবে দেশটিতে পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশি সৈন্য মোতায়েন ছিল। তারা সিয়েরালিয়নের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে দেশটি। যদিও আফ্রিকান এই দেশটির সামান্য কিছু নাগরিক বাংলাদেশি সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবাদে আরও সামান্য কিছু বাংলা শব্দ ও বাক্য জানেন, দাফতরিকভাবে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের ভাষা সেখানে স্থান করে নিয়েছে। এর প্রতীকী মূল্যও অবশ্য কম নয়। একই ভাষা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এতদিন হিন্দি ও বাংলার অবস্থান সমান ছিল। হিন্দি ভারতের বাইরে ফিজিরও রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা। সিয়েরালিয়নের ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে হিন্দির তুলনায় এগিয়ে গেছে বাংলা।

যুক্তরাজ্যে স্বীকৃত যে ১০টি 'অভিবাসী ভাষা' রয়েছে, বাংলা তার পঞ্চম। উইকিপিডিয়ার হিসাবে সাত লাখ বাংলাভাষী অভিবাসী রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করেন। বহির্বিশ্বে ৩০টি দেশের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে বাংলা বিভাগ, সেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার অবাঙালি পড়ুয়া বাংলাভাষা শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করছে। এছাড়া চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ এবং লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের পর ব্রিটেন ও আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়ে থাকে। এর বাইরে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষার সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে। আমেরিকায় কমপক্ষে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও এশীয় গবেষণা কেন্দ্রে বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে। এর মধ্যে নিউইর্য়ক, শিকাগো, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, ভার্জিনিয়া উল্লেখযোগ্য বলে ধরা হচ্ছে।

ইউরোপের ইতালিতে বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং রোম ও ভেনিশ শহর থেকে রেডিও স্টেশনও পরিচালিত হচ্ছে। ইতালি থেকে অনলাইন টেলিভিশন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে শতাধিক ফেসবুক টেলিভিশন চালু রয়েছে। এছাড়া ডেনমার্ক সুইডেনসহ ইউরোপের অনেক দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে বাংলা ভাষার মূদ্রিত ও অনলাইন পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার আলাদা চ্যানেল রয়েছে। আরও অনেক দেশের রেডিওতে বাংলা ভাষার আলাদা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ব্রিটেন ও আমেরিকায় অনেক বাংলাদেশি মালিকানাধীন ও বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, বাংলাদেশের মানুষের মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। অথচ এখনো সেই দেশেও রয়েছেন বহু বাংলাভাষী মানুষ। পাকিস্তানের কারাচিতে প্রায় ২১ লাখ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ চালু আছে। করাচি সিটি করপোরেশনের অন্যতম দাফতরিক ভাষাও বাংলা। ■

# বাংলাদেশের ৪১টি ভাষা

শাহানা আফরোজ

বাংলা ভাষা বাঙালির মায়ের ভাষা। মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এমন ঘটনা শুধুমাত্র বাঙালিদের ঝুলিতেই রয়েছে। বিশ্বের সেরা দশটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রায় ১ হাজার ৩০০ বছরের পুরনো। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলা ভাষা বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা। প্রায় ৯৯% বাংলাদেশির মাতৃভাষা বাংলা। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ও বিশ্বের অন্যতম ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ অনুযায়ী, বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার আবশ্যিক করেছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র একভাষী রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বসবাস করে এমন বাংলাদেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের নিজ নিজ (যেমন চাকমা, মারমা ইত্যাদি) ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে বাংলা ভাষার যথেষ্ট রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং সিলেট অঞ্চল এর ভাষা আদর্শ বাংলা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বহুপূর্বে সিলেট অঞ্চলে সিলেটি নাগরী নামক লিপি দ্বারা সিলেটি ভাষার লিখিত রূপও ছিল তবে বর্তমানে তা আর লেখা হয় না।

বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আরো ৪১টি মাতৃভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এতদিন ধরে প্রচলিত ধারণা ছিল এ ভূখণ্ডে মাতৃভাষা আছে ১৫ থেকে ২৫টি। বিভিন্ন গবেষকদের ব্যক্তিগত গবেষণা ও অনুসন্ধানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ধারাবাহিক গবেষণা ও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এ তথ্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সংখ্যা নির্ণয়ের কাজটি করেছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা ৩৩টি। যার ১৫টিই বিপন্ন ভাষা হিসেবে দেখছেন গবেষকরা। নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া এ ভাষাগুলোর বেশিরভাগেরই কোনো লিপি নেই। লিপি রয়েছে হাতেগোনা দু'একটির। লিপিহীন ভাষাগুলোকে আমরা 'অক্ষরহীন

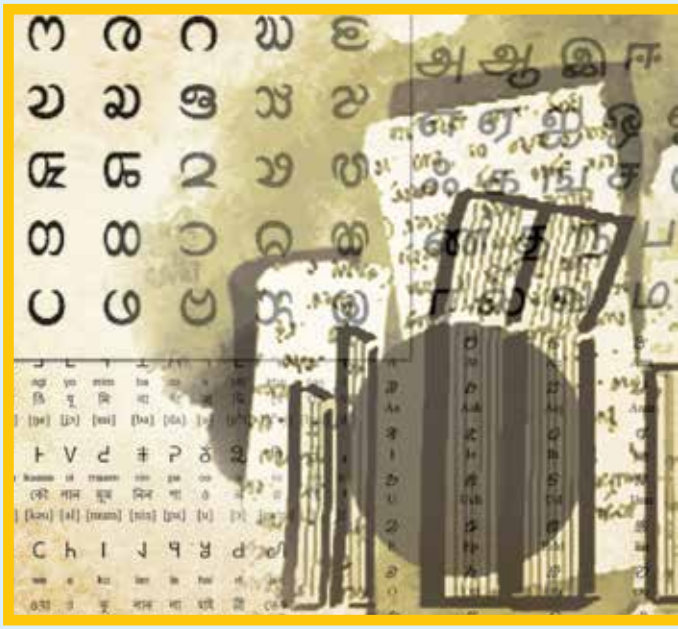

ভাষা' বলে থাকি। গবেষকদের মতে, বাড়তি মাতৃভাষার সংরক্ষণ করার বা টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ না নেয়া হলে একদিন এগুলোর অস্তিত্বই যাবে হারিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার ওপর বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা চালিয়ে যে ভাষাগুলোর সন্ধান পায়। তা হলো– সাঁওতালি, মাহলে, কোল, কোরা বা কোদা, মুন্দারি,

খারিয়া, সাউরা, খাসি, আবেং, আচিক, কুরুখ, মাল্টো, তেলেগু, গারো/ মান্দি, হাজং, কোচ, লালেং/পাত্রা, মারমা, কোকবরক, খুমি, খিয়াং, লুসাই, তংচঙ্গা, ম্রো, রাখাইন, পাংখুয়া, বাউম, রেংমিট্চা, চক, মনিপুরী মেইথেই, লিঙ্গম, সাদরি, মাদ্রাজি, থর, উর্দু, ওড়িয়া, অহমিয়া, মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া, কানপুরী , চাকমা নেপালি এবং কন্দো।

এ ছাড়াও ইতোমধ্যে দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে এমন ভাষাগুলো হলো রাজবংশী, রাই, বাগদি, কোচ, হদি ও ভালু ইত্যাদি। ওঁরাও, মুণ্ডা, মালো, রাউতিয়া, মুশহর ও শবর ভাষাভাষী লোকেরাও নিজেদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। গবেষকরা বলছেন, সিং, কর্মকার, গণ্ড, বেদিয়া, বর্মন ও লোহার ভাষাও আগামী কোন এক সময় ঝুঁকির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে কম চর্চা হয় রেংমিট্চা ভাষা। ২০১৩ সালেও কয়েকটি পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২২ জনের রেংমিটচা ভাষাভাষীর লোকজন পাওয়া যায়। ২০২১ সালে এসে আট বছরের ব্যবধানে সে সংখ্যা হয়েছে মাত্র ছয় জন। বাকীরা ইতোমধ্যে মারা গেছেন।

খাড়িয়া নৃগোষ্ঠীর ভাষার নামও খাড়িয়া। সিলেটের চা বাগানগুলোয় বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার খাড়িয়ার বসবাস। বাংলাদেশে এ ভাষা ব্যবহারকারী একেবারে কম হলেও ভারতে এখনও প্রচলিত রয়েছে এটি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, খাড়িয়া মৃতপ্রায় ভাষা। খাড়িয়া নৃ-গোষ্ঠীর মানুষই খাড়িয়া ভাষায় কথা বলেন। এটি অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষার মুন্ডা গোত্রীয় একটি ভাষা। খাড়িয়া ভাষা ভালোভাবে জানা দুই বোন ভেরোনিকা কেরকেতা ও ক্রিস্টিনা কেরকেতার মুখে টিকে আছে খাড়িয়া ভাষা। ক্রিস্টিনা কেরকেতা বলেন, 'আমরা দুই বোন কথা বলার সময়ই কেবল খাড়িয়া ভাষায় কথা বলি। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারি না। কারণ তারা খাড়িয়া জানে না। তাই তাদের সঙ্গে সাদরি বা বাংলা ভাষায় কথা বলতে হয়।' বাংলাদেশে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলা এই ভাষাকে সংরক্ষণেরও দাবি তাদের। খাড়িয়া ভাষার বর্ণমালা নেই। ব্যাকরণ নেই। ব্যবহারও নেই। ফলে নতুন প্রজন্ম এই ভাষা শেখা বা বলায় আগ্রহ পাচ্ছে না।

তেমনি আরেকটি ভাষা হচ্ছে রাঙামাটি সাজেক আঞ্চলের শৌরা ভাষা। ধারণা করা হয় এ ভাষায়, ১ হাজার মানুষ কথা বলে। বাস্তবে এই ভাষায় কথা বলে মাত্র পাঁচ জন মানুষ। দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় মাত্র ঊনিশটি পরিবারের শখানেক মানুষ কথা বলে 'কড়া' ভাষায়। এছাড়াও কোল ভাষা– ২ হাজার ৮৪৩ জন, মালত- ৮ হাজার জন, কন্দু- ৬ হাজার ৭' শ এর মতো কথা বলে।

শুধু শৌরা বা রেংমিটর্চা নয়– এরকম বিপন্ন ভাষার তালিকায় রয়েছে কোদা, মেগাম, পাঙ্গুখুয়া, বম, চাক, আসোচিন, মরু, কুরুঙ, প্লার, সৌরিয়া, খেয়াং, কড়া, খোজী, কন্দু, মুণ্ডা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা-ইউনেস্কোর মতে, পৃথিবীতে কোনো ভাষায় যদি কথা বলা লোকের পরিমাণ পাঁচ হাজারের কম হয় তবে তা বিপন্ন ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে। এই হিসেবে বাংলাদেশে বিপন্ন ভাষার পরিমাণ চৌদ্দটি। গরেষকদের মতে, বিশ হাজার লোক কথা বলে এমন ভাষাও আমাদের দেশে আছে। তবে আমরা সেগুলোকে বিপন্ন ভাষার তালিকায় রেখেছি। কারণ এর পরে এই ভাষাগুলোতে কথা বলা বা চর্চা করার মতো কেউ থাকবে না।

যে দেশের মানুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ সেই দেশে অনেক ভাষাই বিলুপ্তপ্রায়। ■

# ভাষার গবেষণা

শরিফ উদ্দিন

মাতৃভাষা প্রাকৃতিক। মাতৃভাষা এমন একটি ভাষা যে ভাষা কাউকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হয় না ।জাতির সবার জন্যই সমভাবে বোধগম্য মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। মনের ভাব প্রকাশের চেয়ে আনন্দ অন্য কোনো ভাষায় নেই। এমনি কিছু ভাষা নিয়ে গবেষণার শেষ নেউ। গবেষকেরা দেখেছেন ভাষার পরিবর্তন যেমন দ্রুত হয়। তেমনি একটি ভাষা টিকেও থাকে হাজার বছর। আবার কোনো ভাষা শ্রুতি মধুর হলে সহজে বুঝা যায় না। আবার কোন ভাষা শিখতে কুবই কষ্ট হয়। বন্ধুরা আজ তোমাদের এমনি কিছু ভাষা সম্পর্কে জানাব:

**সবচেয়ে দুঃসাধ্য ভাষা**

**ম্যান্ডারিন:** ম্যান্ডারিন ভাষায় রয়েছে হাজার রকমের অক্ষর এবং তা একেকজনের স্বরের উপর নির্ভর করে একেক ধরনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

**আইস্ল্যান্ডিক:** এই ভাষাটিতে প্রায়ই নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হয় । তাই পরিবর্তনের গতি অন্য যে-কোনো ভাষার থেকে বেশি।

## দ্রুততম ভাষা

অস্ট্রিয়ার ক্ল্যাগেনফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জারট্রড ফেনক-ওজলন জানিয়েছেন, কথা বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুততম ভাষা হলো 'তেলেগু'। প্রধানত দক্ষিণ ভারতের প্রায় আট কোটিরও বেশি মানুষ কথা বলে এ ভাষায়।

**জাপানিজ:** এতে আছে তিন ধরনের লিখন পদ্ধতি- হিরাগানা,কাটাকানা এবং কাঞ্জি। জাপানিরা হাজার রকমের ক্যারেক্টার শিখে তাদের লিখন পদ্ধতির জন্য।

**হাংগারিয়ান:** হাংগেরিয়ান ভাষা একেবারেই ব্যতিক্রম, এটি ইংরেজিভাষীদের ভাষার ব্যবহারের নিয়ম হতে ভিন্নধর্মী নিয়ম মেনে চলে।

**কোরিয়ান:** কোরিয়ান ভাষাটি স্বতন্ত্র। এতে রয়েছে ৭টি ভিন্ন মাত্রা যা কোরিয়ান ভাষীরা ভিন্নভাবে স্থান, মানুষ ভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে।

**আরবি:** মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের সরকারি ভাষা এটি তবে কঠিন ভাষার মধ্যে অন্যতম। এতে আছে প্রতিটি অক্ষরের ৪টি ভিন্ন রূপ যা শব্দের ব্যবহার এর উপর নির্ভর করে।

**ফিনিশ:** হাংগেরিয়ান ভাষার মতো এটিও আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। ফিনিশ ভাষীদের অনুবাদ অন্যান্য স্বাভাবিক অনুবাদ এর মতো হয় না।

**পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ভাষা**

প্রথম ভাষা কী ছিল তা নিয়ে তর্কের কোনো শেষ নেই। তবুও ভাষাবীদরা বহু ভাষার উপরে গবেষণা করার পর ৭টি প্রাচীন ভাষা পেয়েছে যা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**আরবি:** সারা বিশ্বে ২৯ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ৫১২ সিই-তে। মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশের সরকারি ভাষা হল আরবি।

**সংস্কৃত:** ভারতের এই প্রাচীনতম ভাষার উৎপত্তি প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এখনও বেশ কিছু মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

**গ্রিক:** একটা সময় ছিল যখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং শিক্ষাবীদরা গ্রিক ভাষাতেই কথা বলতেন এবং লিখতেন। সময়কাল জানা যায় ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম সরকারি ভাষা।

**চীনা ভাষা:** পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি মানুষ চীনা ভাষাকেই তাদের প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচনা

## মিষ্টি ভাষা

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের রয়েছে হাজার হাজার ভাষা। ২০১০ সালে ইউনেস্কোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর পৃথিবীর সবথেকে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

করেন। ১২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই ভাষার উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তামিলের পাশাপাশি চীনা ভাষাকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা হিসেবে ধরা হয়।

**হিব্রু:** অনেকেই বিশ্বাস করেন গত ৫ হাজার বছর ধরে হিব্রু ভাষার ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেই এর উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মাত্র ৯০ লাখ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

**তামিল:** ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এর ইতিহাসের হদিস পাওয়া গেলেও বিশ্বাস করা হয় এর উৎপত্তি ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ মানুষ তামিল ভাষায় কথা বলেন।

**লাতিন:** ৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমান সাম্রাজ্যে এর উপস্থিতির কথা জানা যায়। পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও এই ঐতিহ্যবাহী ভাষাটি তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এখনও পোল্যান্ড এবং ভ্যাটিকান সিটিতে সরকারি ভাষা লাতিন।

### সবচেয়ে বেশি মানুষের ভাষা

বিশ্বের সকল দেশ ও অঞ্চলের মানুষ কথা বলেন তাদের মায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। হাজার ভাষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ৬ ভাষায় কথা বলেন :

**ইংরেজি:** এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১৩৪৮ মিলিয়ন বা ১৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা।

**ম্যান্ডারিন (চাইনিজ):** এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১১২০ মিলিয়ন বা ১১২ কোটি।

**হিন্দি:** হিন্দি বিশ্বের অন্যতম বড়ো দেশ ভারতের সরকারি ভাষা। এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৬০০ মিলিয়ন বা ৬০ কোটি।

**স্প্যানিশ:** এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৫৪৩ মিলিয়ন বা ৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ। স্প্যানিশ ২০টি দেশে সরকারি ভাষা । জাতিসংঘের ছয়টি সরকারি ভাষার মধ্যে স্প্যানিশ একটি।

**আরবি:** এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ২৭৪ মিলিয়ন বা প্রায় ২৮ কোটি। বিশ্বের ২৫ টিরও বেশি দেশ আছে যারা আরবিকে একটি সরকারি বা আধা-সরকারি ভাষা হিসেবে মনে করে।

**বাংলা:** এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ২৬৮ মিলিয়ন বা ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ। বাংলা হলো একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কথিত। শীর্ষ ১০টি ভাষার মধ্যে ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে।

## শক্তিশালী ভাষা

আবুধাবিভিত্তিক গবেষক কাই চ্যান, ভাষার শক্তি গবেষণায় পাঁচটি সূচক ব্যবহার করে এই উপসংহারে আসেন যে ইংরেজি সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা। তার পরেই রয়েছে মান্দারিন, ফরাসি, স্প্যানিশ এবং আরবি ভাষা।এমনকি ২০৫০ সালের মধ্যেও ইংরেজি ভাষাই সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা থাকবে।

সকল ভাষারই থাকে নিজস্ব অদ্বিতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য, নির্দিষ্ট কিছু তারতম্য, যা বিভিন্ন ভাষীদের নিজ নিজ পরিচয় বহন করে থাকে। তাই সকল ভাষার প্রতিই বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদেরই কর্তব্য। ■

প্রাবন্ধিক

# ভাষার চিত্র-বিচিত্র

সাজিদ হোসেন

পৃথিবীতে কত যে বিচিত্র ভাষা আছে! সেই সাথে আছে ভিন্নতা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সামনে রেখে সব ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা জানাতেই আমাদের এই আয়োজন

- পৃথিবীতে ভাষা আছে ৭ হাজারের বেশি।
- মাত্র ২৩টি ভাষাতে কথা বলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ।
- অন্তত দুটি ভাষায় কথা বলতে পারে পৃথিবীর

অর্ধেক মানুষ।

- বিলুপ্তির পথে আছে পৃথিবীর প্রায় ২৪ হাজার ভাষা।
- দেশ হিসেবে পাপুয়া নিউগিনিতে আছে সবচেয়ে বেশি ভাষা, সংখ্যাটি ৮৪০।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কথ্য ভাষা হলো স্প্যানিশ।
- সবচেয়ে বেশি শব্দ আছে ইংরেজি ভাষায় আড়াই লাখের বেশি।
- জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তরজার্তিক ভাষা ৬টি। যথা–১.আরবি ২.চীনা ৩.ইংরেজি ৪.ফরাসি ৫. রুশ ৬.স্পেনীয় স্পেনিশ।
- ৭৪টি বর্ণ নিয়ে সবচেয়ে লম্বা বর্ণমালা কম্বোডিয়ানদের।
- 'Alphabet' শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক বর্ণ থেকে 'alpha' ও 'beta'।
- পাপুয়া নিউগিনির ভাষা রোটোকাসের বর্ণমালায় আছে মাত্র ১১টি বর্ণ।
- সবচেয়ে বেশি অনূদিত গ্রন্থ হলো বাইবেল।
- বই, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য ২০০-র বেশি কৃত্রিম ভাষা তৈরি হয়েছে।
- রান্নাবান্না ও ব্যালে নাচে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই এসেছে ফরাসি থেকে।
- প্রথম ছাপা হওয়া বইটি লেখা হয়েছিল জার্মান ভাষায়।
- সাধারণত একটা মানুষ রোজ মাত্র কয়েক শ শব্দ ব্যবহার করে।
- স্পেনের উপকূলীয় ভাষা 'লা গোমেরা' পুরোপুরি শিস দিয়ে তৈরি।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে দাপ্তরিকভাবে প্রায় ২৪টি ভাষা ব্যবহৃত হয়।
- যুক্তরাজ্যে ফরাসিকে প্রধান বিদেশি ভাষা হিসেবে শেখানো হয়।
- ফ্রান্স-স্পেন সীমান্তের পিরেনিজ পর্বতবাসিন্দারা 'বাস্ক'-এ কথা বলেন, এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত কোনো ভাষার একেবারেই সম্পর্ক নেই।
- ইউরোপে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয় জার্মান ভাষায়।
- ফরাসিতে প্রতিবছর ২০ হাজারের বেশি নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।
- ২৭ প্রায় সাতশ আশি কোটির মধ্যে ১৫০ কোটির বেশি মানুষ কথা বলেন মাত্র তিনটি ভাষায়- ম্যান্ডারিন, স্প্যানিশ ও ইংরেজি।
- অধিকাংশ মানুষ ইংরেজিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ভাবলেও আদতে দেশটির কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই।

- ৩০ শতাংশ ইংরেজি শব্দ এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে।
- ব্রাজিলের একটি সংখ্যালঘু ভাষা ইতালিয়ান।
- ১৫ লাখের বেশি আমেরিকানের মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা ফরাসি।
- হাওয়াইয়ান ভাষায় 'বৃষ্টি'র প্রতিশব্দ আছে দুইশর বেশি।
- ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল না।
- ইন্দোনেশীয় ভাষায় 'এয়ার' অর্থ পানি।
- বতসোয়ানার 'খোইসান' ভাষায় কথা বলার শুরুতে ৫ বার 'ক্লিক'-জাতীয় আওয়াজ করতে হয়।
- দক্ষিণ আফ্রিকার দাপ্তরিক ভাষা সবচেয়ে বেশি ১১টি।
- পৃথিবীর সব ভাষার দুই-তৃতীয়াংশের উৎপত্তি আফ্রিকা ও এশিয়ায়।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফরাসিভাষীর শহর কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসা।
- মহাকাশে প্রথম কথা বলা হয় রুশ ভাষায়।
- প্রতি দুই সপ্তাহে গড়ে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
- 'ক্রিপ্টোফেশিয়া' এমন এক ভাষা, যা শুধু যমজরাই বুঝতে পারে।

প্রাবন্ধিক

**জুলকার নাইন প্রাচুর্য**
চতুর্থ শ্রেণি
মুন্সি আব্দুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পিলখানা, ঢাকা

# বাংলা নাম ইংরেজিতে লেখা

তারিক মনজুর

বিনু বলল, 'দাদু, সবাই ঠিক করেছে, ওর নাম রাখা হবে বন্যা।'

'...কিন্তু মুশকিল হলো ইংরেজিতে বন্যা লেখা হবে কীভাবে?' নেহা সাথে যোগ করে।

ভাষা-দাদু প্রথমে বিনুর দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন নেহার দিকে। ওদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। তখন দুপুর ঠিক বারোটা। বিনু আর নেহা এসেছে ভাষা-দাদুর বাড়িতে। কয়েকদিন আগে বিনুর ফুপুর মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম রাখা হয়েছে বন্যা। ওরা জানতে চায়, ইংরেজিতে বন্যা বানান কেমন হবে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'ইংরেজিতে বিনু লিখতে পারো, নেহা লিখতে পারো। তাহলে ইংরেজিতে বন্যা লিখতে সমস্যা কোথায়?'

বিনু বলল, 'বিনু লিখলে হয় B-i-n-u। নেহা লিখলে হয় N-e-h-a। কিন্তু বন্যা লিখবো কীভাবে? এখানে তো একটা য-ফলা আছে।'

নেহা বলল, 'দাদু, আমি জানি, য-ফলার জন্য একটা ওয়াই দিতে হবে। ইংরেজিতে বন্যা লিখলে হবে B-o-n-y-a। তাই না?'

দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'মনে করো কারো নাম প্রজ্ঞা। ইংরেজিতে প্রজ্ঞা লিখলে কী হবে?'

বিনু দেরি না করেই বলল, 'প্রজ্ঞা লিখলে হবে P-r-o-g-g-a।'

নেহা সাথে সাথে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, এমন হবে না। প্রজ্ঞা শব্দে যুক্তবর্ণ জ্ঞ-এর মধ্যে জ আর ঞ আছে।' তারপর ভাষা-দাদুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, জ আর ঞ-কে একসাথে ইংরেজিতে লিখলে কী হবে?'

ভাষা-দাদু উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কারো নাম যদি রশ্মি হয়, সে ইংরেজিতে কী লিখবে?'

বিনু বলল, 'দাদু, R-o-s-s-h-i লিখলে হবে না?'

নেহা বলল, 'না, না। রশ্মি শব্দে শ আর ম আছে। এই ম-এর জন্য একটা এম দিতে হবে। লিখতে হবে R-o-s-m-i। তাই না, দাদু?'

দাদু বললেন, 'কারো নাম বিশ্ব হলে কীভাবে লিখবে?'

এবার বিনু একটু রাগ হয়, 'উত্তর খুঁজতে এসেছি আমরা। আর দাদু, তুমি কিনা প্রশ্ন করেই চলেছ!'

ভাষা-দাদু বললেন, 'আচ্ছা, আর প্রশ্ন করছি না। এটাই শেষ। এটার উত্তর পেলেই আমার চলবে।'

বিনু বলল, 'আগেরগুলো হয়েছে কি না, তাই বুঝতে পারছি না। এটার উত্তর ঠিক হলেই কী? না হলেই কী?'

'আহা, তোমাদের কী মনে হয়, বলো না!' ভাষা-দাদু অনুরোধ করেন।

বিনু বলল, 'বিশ্ব ইংরেজিতে লিখলে হবে B-i-s-s-h-o।'

'না, দাদু, এভাবে লিখলে হবে না।' নেহা আপত্তি করে। বলে, 'বিশ্ব শব্দে একটা ব-ফলা আছে। এর জন্য একটা W দিতে হবে।'

'তোমাদের কাছ থেকে যতটুকু বুঝে নেওয়ার আমি বুঝে নিয়েছি। এবার আমার কথা শুরু করি।' ভাষা-দাদু বলতে শুরু করেন, 'বাংলা ফলাচিহ্নের উচ্চারণ কিন্তু সবসময় এক রকম থাকে না। শুরুতে ম-ফলা, ব-ফলা থাকলে উচ্চারণ হয় না। যেমন– স্মরণ, স্বাধীন এসব শব্দের ম-ফলা, ব-ফলার উচ্চারণ নেই। এখন কী করবে? এখনও কি M এবং W যোগ করবে?'

ভাষা-দাদু কী বলছেন, বিনু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই সে দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদু সহজ করে বলো।'

ভাষা-দাদু এবার একটা কাগজ নিলেন। কাগজে লিখলেন:

স্মরণ–Smoron/Soron

স্বাধীন–Swadhin/Sadhin

তারপর বললেন, 'এখানে দুটি করে বানান আছে। প্রথম উদাহরণে একটিতে ম-ফলার জন্য এম আছে; আরেকটিতে এম নেই। আবার, দ্বিতীয় উদাহরণে একটিতে ব-ফলার জন্য W আছে; আরেকটিতে W নেই। ...কী মনে হয়? কোনভাবে লেখা উচিত?'

বিনু বলল, 'আমার মনে হয়, উচ্চারণ যেমন হচ্ছে, তেমন করেই লেখা উচিত। ম-ফলার জন্য বাড়তি এম এবং ব-ফলার জন্য বাড়তি ডাবলিউ দেওয়ার দরকার নেই।'

নেহা আপত্তি করল। বলল, 'দাদু, আমি বিভিন্ন দোকানের নাম সবসময় লক্ষ্য করি। বাংলা নাম ইংরেজিতে লেখার সময় য-ফলার জন্য ওয়াই, ব-ফলার জন্য W এবং ম-ফলার জন্য M লিখতে দেখেছি।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'আলোচনা শেষে এখন সিদ্ধান্তে পৌঁছার সময় হয়েছে।'

সিদ্ধান্তের কথা শুনে দুজনেই নড়েচড়ে বসল।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'এক সময় য-ফলার জন্য Y, ব-ফলার জন্য W, আর ম-ফলার জন্য M যোগ করা হতো। তবে, এখন বলা হয়ে থাকে, শব্দটির বাংলা উচ্চারণ যেমন, তেমন করেই ইংরেজিতে লিখতে হবে। এই সূত্রে কিছু শব্দ লিখে দেখাই। বলে তিনি কাগজে লিখলেন:

সত্য–Sotto
তন্বী–Tonni
আত্মা–Atta

তারপর বললেন,'ফলাচিহ্ন ছাড়া অন্য যুক্তবর্ণ থাকলেও উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন...' ভাষা-দাদু আবার কাগজে লিখতে থাকলেন:

**'বাংলা ফলাচিহ্নের উচ্চারণ কিন্তু সবসময় এক রকম থাকে না। শুরুতে ম-ফলা, ব-ফলা থাকলে উচ্চারণ হয় না। যেমন– স্মরণ, স্বাধীন এসব শব্দের ম-ফলা, ব-ফলার উচ্চারণ নেই। এখন কী করবে? এখনও কি M এবং W যোগ করবে?'**

শিক্ষা–Shikkha
প্রজ্ঞা–Progga
ব্রহ্মা–Bromma

বিনু খুশি হয়ে বলল, 'আমারটাই ঠিক হলো।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'এখানে ঠিক-ভুলের ব্যাপার না। ব্যাপার হলো, আগে সংস্কৃত উচ্চারণ অনুযায়ী যুক্তবর্ণের ইংরেজি রূপ দেওয়া হতো। তখন ক্ষ লিখতে ks, জ্ঞ লিখতে jyea, আর হ্ম লিখতে hm লেখা হতো। তবে, শব্দের বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী লিখলে অনেক রকম সংকট কাটানো যায়।' বিনু আর নেহাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি যোগ করেন, 'বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার নামও এখন শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে।'

নেহা বলল, 'বুঝলাম, কোনো নামকে ইংরেজিতে লেখার জন্য বাংলা বানান দেখার দরকার নেই। বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরেজিতে লিখতে হবে।'

বিনু বলল, 'বন্যা লিখতে গেলে তাহলে হবেই-B-o-n-n-a। তাই না, দাদু?'

'ঠিক তাই! এই তো বুঝেছ!' ভাষা-দাদু উচ্ছ্বসিত হন। তারপর অবাক হয়ে বলেন, 'এখানে বন্যার কথা আসছে কেন?'

বিনু বলল, 'দাদু, আমার ফুপুর একটা মেয়ে হয়েছে। ওর নাম ইংরেজিতে লিখলে কী হবে, সেটা নিয়ে আলোচনার জন্যই তো এত কথা হচ্ছে!'

ভাষা-দাদু দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললেন, 'ও, মনে পড়েছে। ইদানীং একটু একটু ভুলে যাওয়া রোগ হয়েছে আমার।'

বিনু আর নেহা ভাষা-দাদুকে অনেক ধন্যবাদ দিলো। তারপর যাওয়ার আগে নেহা বলল,'এই ধন্যবাদ শব্দটি পুরনো নিয়মে লিখলে হবে D-h-o-n-y-a-b-a-d। আর নতুন নিয়মে লিখলে হবে D-h-o-n-n-o-b-a-d।

'তোমরা নতুন যুগের মানুষ। নতুন নিয়ম অনুসরণ করেই লিখবে, আশা করি।' ভাষা-দাদুর ঘর থেকে ওরা দুজন অনেকখানি বেরিয়ে গেছে। তাই একটু উঁচু গলায় বললেন, 'আর হ্যাঁ, নতুন যুগের নতুন শিশুটির জন্যও শুভকামনা রইল।' ■

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# শুদ্ধ করে শিখি

| বর্ণ | ভুল | শুদ্ধ |
| --- | --- | --- |
| অ | সরে অ | স্বর অ |
| আ | সরে আ | স্বর আ |
| ই | রশ্শি | হ্রস্ব ই |
| ঈ | দীর্ঘি | দীর্ঘ ই |
| উ | রশশু | হ্রস্ব উ |
| ঊ | দীর্ঘু | দীর্ঘ উ |
| ং | অনুস্বার | অনু স্বর |
| ঙ | উম্মো | উঁঅ |
| ঞ | নিও | ইঁঅ |
| জ | বইর্গাজ্জ | বর্গীয় জ |
| ন | দইন্তন্ন | দন্ত্য ন |
| ণ | মর্ধিনান্ন | মূর্ধন্য ন |
| ষ | প্যাট কাডা মুর্ধার ষ | মূর্ধন্য ষ |
| স | দইন্তস্য | দন্ত্য স |
| শ | তালিবাশ্য | তালব্য শ |
| ড় | ডইশিন্য ড় | ড শূন্য ড় |
| ঢ় | ঢইশিন্য ঢ় | ঢ শূন্য ঢ় |
| ৎ | খণ্ডত্ত | খণ্ড ত |

# বসন্ত এসে গেছে

আলমগীর কবির

ডালে ডালে কচি পাতা সবুজ সবুজ,
বসন্ত এসে গেছে মনটা অবুঝ।

রাঙা ফুল প্রজাপতি পাখিদের মেলা,
রোদ পাখি নেচে নেচে করে শুধু খেলা।

হাওয়াতে দোল খায় ফুলকুঁড়ি হেসে,
ফুল থেকে মিঠে ঘ্রাণ আসে ভেসে ভেসে।

সবুজের চিঠি পেয়ে আলো মাঠ জুড়ে,
ভোর থেকে খেলা করে পাখিদের সুরে।

চাষিদের কোলাহল যায় ধীরে থেমে
তারপরে স্বপ্নিল রাত আসে নেমে।

খুশি নিয়ে জেগে থাকে মায়া মাখা চাঁদ,
ভালোবাসি দেশ মাকে জাগে বুকে সাধ।

# ফাগুন এল

জাওয়াদ আহমেদ

বসন্তে কোকিলের ডাকে
উদাস হয়ে যায় মন
ইচ্ছে করে দূর আকাশে
ডানা মেলি যখন তখন।

শীতের আমেজ মুছে
প্রকৃতির সাজে নতুন সজ্জায়
অশোক ফুলের বাহার
বাংলার পথে প্রান্তরে দেখা যায়।

ষষ্ঠ শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল
মান্ডা, ঢাকা

**শারিকা তাসনিম নিধি**
চতুর্থ শ্রেণি,
চিলড্রেন একাডেমি
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

# তিন কিশোরীর স্বর্ণপদক অর্জন

২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের সামিয়া মেহনাজ, মাইশা সোবহান ও মার্জিয়া অফিফার টিম অ্যাফিসিয়েনাদোস স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। থাইল্যান্ডের ফুকেট শহরে ১২-১৫ ই জানুয়ারি এই রোবট অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। রোবট ইন মুভি চ্যালেঞ্জ গ্রুপে তারা এ পদক পেয়েছে।

সামিয়াদের দল অ্যাফিসিয়েনাদোস-এর মূল বিষয় ছিল স্মার্ট সিটি। এর অধীনে ছিল আরো অনেকগুলো সাব-থিম। আর এজন্য তারা প্রস্তুত করেছিল ছয়টি রোবট।

এর আগে গত ২৫-২৬ শে অক্টোবর বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। জাতীয় পর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ৪-৫ ই নভেম্বর একটি আবাসিক আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী ক্যাম্প আয়োজিত হয়। সেখানে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে রোবটিকস বিষয়ে আরো প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের জন্য ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ দল নির্ধারণ করা হয় সেই দলই থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

এবারের অলিম্পিয়াডে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

স্বর্ণপদক জয়ী সামিয়া মেহনাজ ও মাইশা সোবহান ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। আর মার্জিয়া আফিয়া সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দশম শ্রেণিতে পড়ে।

উল্লেখ্য, এবারের ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ দল মোট ১৩ টি পদক অর্জন করেছে। এর মধ্যে একটি স্বর্ণপদক, দুইটি রৌপ্যপদক, দুটি ব্রোঞ্জপদক ও আটটি টেকনিক্যাল পদক রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

# সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের নারী ফুটবলে আরো একটি সাফল্য। এবার এসেছে অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলারদের হাত ধরে। এর আগে নারী অনূর্ধ্ব ১৫, ১৮, ১৯, ২০ শিরোপার স্বাদ নেয় বাংলাদেশ। নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ মানেই বাংলাদেশের দাপট। হোক বয়সভিত্তিক কিংবা জাতীয় দল পর্যায়ের। বয়সভিত্তিক ও জাতীয় দল সাব মিলিয়ে দশমবারের মতো ফাইনাল খেললো বাংলাদেশ। এর মধ্যে পাঁচবার সেরার মুকুট জিতেছে। তারা ৯ই ফেব্রুয়ারি কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে নেপালকে ৩-০ গোলে হাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়নের মুকুট জিতল বাংলাদেশ। দলের পক্ষে জোড়া গোল করেন শহিদা আক্তার রিপা। একটি গোল করেন অধিনায়ক শামসুন্নাহার-জুনিয়র। গত বছর কাঠমান্ডুতে নেপালকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল জাতীয় নারী দল। পাঁচ মাস পরে সেই নেপালকে হারিয়েই জয়ের মালা গলায় পরলো বাংলাদেশের নারী অনূর্ধ্ব-২০।

ঘরের মাঠে বাংলাদেশ দল খেলেছে দুর্বার গতিতে। দারুণ ছন্দে ফাইনালে দাপুটে ফুটবল খেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করলো স্বাগতিকরা। এবারের আসরে তিনটি জয় ও একটি ড্রয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। বাকি চারটি শিরোপাও অপরাজিত থেকে জিতেছিল বাংলাদেশ। শুরু থেকেই নেপালকে চাপে রেখে খেলছিল বাংলাদেশ। গোলের দেখা মিলল ৪২তম মিনিটে রিপার পা থেকে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শামসুন্নাহার। তার এই গোলেই ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ। আসরের সর্বোচ্চ ৫টি গোল করেছেন অধিনায়ক শামসুন্নাহার। জিতেছেন টুর্নামেন্ট সেরা পুরস্কার।

দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলাদেশ চালাতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। ৮৭তম মিনিটে গোল পোস্টের সামনে থেকে রিপার ফ্রি কিক উন্নতির পা ছুঁয়ে বল জড়ায় জালে। পেয়ে যায় বাংলাদেশ আরেকটি গোল। নিশ্চিত হয় বড়ো জয় নিয়ে মাঠ ত্যাগ করার পালা। নেপালও কয়েকটি ভালো আক্রমণ করে। কিন্তু ফিনিশারের অভাব ও বাংলাদেশের গোলরক্ষক রূপনা চাকমার অসাধারণ নৈপুণ্যে গোলের দেখা পায়নি তারা।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

# স্বর্ণজয়ী অ্যাথলেট

দশম এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়নশিপের ৬০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশের ইমরানুর রহমান। ১১ই ফেব্রুয়ারি রাতে কাজাখস্তানের আস্তানায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ৬০ মিটার দৌড় ইভেন্টে ৬.৫৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করেছেন তিনি। দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্য জেতা হংকংয়ের শাক কাম চিংয়ের চেয়ে যা ০.০৬ সেকেন্ড কম। ৬.৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন হংকংয়ের লি হং কিট।

ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া এই এ্যাথলেট বাংলাদোশের হয়ে ইতিহাস গড়েন। প্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে বড়ো বড়ো দেশের অ্যাথলেটদের পেছনে ফেলে স্বর্ণ জয়ের কৃতিত্ব দেখান।

এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকসে ইমরানুর ক্যারিয়ারের সেরা টাইমিং করেছেন। এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে ফাইনাল পর্বে। এর আগে তার ব্যক্তিগত সেরা টাইমিং ছিল ৬ দশমিক ৬৪ সেকেন্ড। সেটি তিনি করেছিলেন ২০২২ সালে বেলগ্রেডে বিশ্ব ইনডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে।

১১ই তারিখ সকালে কাজাখস্তানে এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় হিটে ৬ দশমিক ৭০ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হন। এরপর সন্ধ্যায় সেমিফাইনালে ৬ দশমিক ৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন ইমরানুর। যেখানে তিনি ১৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হন। এরপর রাতে ফাইনালে নিজের আগের সব রেকর্ড ভেঙে স্বর্ণ জিতে ইতিহাস গড়েন এই অ্যাথলেট। এবার ১৮ দেশের প্রতিযোগিকে পেছনে ফেলে স্বর্ণ জিতেন তিনি।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

## বাংলায় ১৪৯ রায় ও আদেশ

দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত ও হাইকোর্টের বিভিন্ন ব্যাঞ্চ থেকে একদিনে বাংলায় ১৪৯টি রায় ও আদেশ হয়েছে। ভাষা সৈনিক ও ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনে এ রায় কার্যকর করা হয়। এদিন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ১৪৫টি আদেশ বাংলায় দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বলেছেন এখন থেকে চেম্বার আদালতে বাংলায় আদেশ দিয়ে যাবেন। এদিন প্রথমে বাংলায় রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ। উচ্চ আদালতে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলায় রায় ও আদেশ দেওয়া শুরু হয়। প্রয়াত বিচারপতি এআরএম আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলায় আদেশ দেওয়া শুরু করেন। এরপর সাবেক বিচারপতিদের মধ্যে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি হামিদুল হক, বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বাংলায় বেশ কয়েকটি রায় দেন।

## শহিদমিনারে শ্রদ্ধা রাজা চার্লসের

বাংলাদেশি ও ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানাতে লন্ডনের ব্রিকলেন বাংলাপাড়া ঘুরে গেলেন যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস। ৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি এই সফরটি করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন রানি কনসর্ট ক্যামিলা। এ ঘটনায় উচ্ছ্বসিত গোটা বাংলাটাউন। যুক্তরাজ্যের নতুন রাজার সফরের আয়োজন করেছিলেন 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাওয়ার এন্ড ইন্সপিরেশন' (বিবিপিআই) সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আয়েশা কোরেশী ও টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলর আবগান উল্লাহ। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মরণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া রাজার এ যাত্রা বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। রাজা ও কুইন কনসর্টকে এক নজর দেখতে কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল রাস্তার দু'ধারে। আলতাব আলী পার্কের শহিদমিনারে এরপর রাজা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর তিনি শহিদমিনার প্রাঙ্গনে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। ব্রিকলেনের অন্যতম বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ 'গ্রামবাংলায়' বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের সঙ্গে পরিচিত হন রাজা ও রাজকীয় অতিথিরা।

# জাতিসংঘের বাংলা ফন্ট ইউনিকোডে




আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবার অনলাইনে বাংলা ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনতে ইউনিকোডসহ 'ইউএন বাংলা' ফন্ট সাতটি ভিন্নরূপে প্রকাশ করেছে। বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে ইউএনডিপি নতুন ফন্টগুলো প্রকাশ করেছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ইউএনডিপির বাংলাদেশ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফন্টের ইউনিকোড সংস্করণ উদবোধন করা হয়। বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার এবং শুভেচ্ছা দূত জয়া আহসান আনুষ্ঠানিকভাবে ইউএন বাংলা ফন্টের ইউনিকোড সংস্করণের উদবোধন করেন। ইউএন বাংলা ফন্ট প্রথম ২০২০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু একটি আঙ্গিকে অফলাইনে ব্যবহারের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সব বাংলাভাষীর জন্য ইউএন বাংলা ফন্টের ইউনিকোডে সংস্করণ চালু করা হয়েছে। তাই যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপির ওয়েবসাইট থেকে ফন্টটি নামিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। ফোনের পাশাপাশি কম্পিউটারেও এই ফন্ট ব্যবহার করা যাবে। আমরা যারা লেখালেখি করি তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি দারুণ সংবাদ। ইউএন বাংলা ফন্টটি দিয়ে খুব দ্রুত ইউএনডিপি বাংলাদেশের ওয়েবসাইটটি বাংলাতে প্রকাশ করা হবে।

# পায়ে হেঁটে বই বিলি

তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের এ যুগে প্রবীণ একজন মানুষ ১০ বছর ধরে মানুষের বাড়ি বাড়ি বই বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি একজন 'জ্ঞানের ফেরিওয়ালা' নামে পরিচিত। নাম তার সুনীল কুমার গাঙ্গুলী। বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের কুমরিয়া গ্রামে। পরনে রয়েছে তার পুরনো জ্যাকেট, প্যান্ট, পায়ে রাবারের জুতা, গলায় মাফলার প্যাঁচানো, কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো ও হাতে বেতের লাঠি। আঁকাবাঁকা রাস্তায় লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছেন তিনি এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। তার ঝোলা ভর্তি বই, সবই তার নিজের। মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেই বই বিলি করছেন। ৭৫ বছর বয়সেও রোজ নিয়ম করে মানুষের দ্বারে দ্বারে বই নিয়ে হাজির হন তিনি। তার একটাই চাওয়া লোকে যেন একটু জানে, বোঝে ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। সুনীল গাঙ্গুলী ছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বই বিলি করে বেড়ান তিনি। এলাকার বিভিন্ন বয়সের লোকজনকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। সুনীল গাঙ্গুলীর নিজের একটি পাঠাগার রয়েছে। পাঠাগারটির নাম 'চন্দ্রিকা জ্ঞান পাঠাগার'। এই পাঠাগারে ৬ শতাধিক বই রয়েছে। সেখানে বইয়ের তালিকা দেখে পাঠক বই পছন্দ করলে তিনি বাড়িতে সেই বইটি তাদের পৌঁছে দেন। পড়া শেষ হলে আবার ফেরত নিয়ে আসেন। ছোটোবেলা থেকেই বই পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল সুনীল কুমার গাঙ্গুলীর।

*প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি*

# ছোটোদের আঁকা

**শান্ত,** পঞ্চম শ্রেণি, দক্ষিণ পূর্ব মাইটভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ

**জায়েদ হক,** চতুর্থ শ্রেণি, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

# ছোটোদের আঁকা

**আব্দুল কাদের জিলানী**, প্রথম শ্রেণি, মনপুরা স্কুল ও কলেজ, মিরপুর

**হিল্লোল রায়**, প্রথম শ্রেণি, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

# নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
**google play store**-এ
**nobarun** লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
**e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd**

# অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

**সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
**তথ্য ভবন**
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

## করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

# নো মাস্ক নো সার্ভিস

**মাস্ক নাই তো সেবাও নাই**

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-08, February 2023 , Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

**চলচ্চিত্র ও প্রকাশানা অধিদপ্তর**
**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা